দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

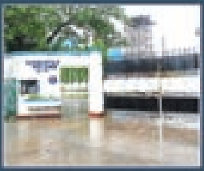

রাজনীতির স্বার্থেই কি বন্ধ শিল্পের পতিত জমি ব্যবহার করা যাচ্ছে না?
— পৃ: ১৬

সৈনিকের সম্মান নষ্ট হচ্ছে
— পৃ: ২৭

৬৮ বর্ষ, ২ সংখ্যা।। ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫।। ২৭ ভাদ্র - ১৪২২।। website : www.eswastika.com

পাকিস্তান কি ভারতকে টেনে যুদ্ধে নামাবেই?

* ১৯৯০ - কার্গিল যুদ্ধ * ২০০১ - সংসদ আক্রমণ * ২০০৪ - মুম্বইয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলা
* ২০১৫ সালেই ২৫০ বার যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে ভারতীয় সীমান্তে হামলা

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ২ সংখ্যা, ২৭ ভাদ্র, ১৪২২ বঙ্গাব্দ
১৪ সেপ্টেম্বর - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৭,
Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪
সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015
R N I No. 5257/57
দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-১০

খোলা চিঠি : কংগ্রেসের নোংরা পরিষ্কারই বড় অভিযান মোদীর ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

গুরুদাসপুরের ঘটনা আবার মনে করিয়ে দিল সুরক্ষা বাহিনীর কঠোর নজরদারি ছাড়া গণতন্ত্র রক্ষা করা যাবে না
▯ মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অঃ প্রাঃ) ▯ ১২

পাকিস্তান কি ভারতকে টেনে যুদ্ধে নামাবেই?
▯ দেবীপ্রসাদ রায় ▯ ১৪

রাজনীতির স্বার্থেই কি বন্ধ শিল্পের পতিত জমি ব্যবহার করা যাচ্ছে না? ▯ অম্লানকুসুম ঘোষ ▯ ১৬

অপরাধীদের সহজ শিকার শহরবাসী বৃদ্ধ দম্পতিরা
▯ কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ২০

নিছক পৌত্তলিকতা আর উৎসব! না বিজ্ঞান ও সত্যের তপস্যা
▯ প্রীতীশ তালুকদার ▯ ২১

শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়িনী রুক্মিণী ▯ সুতপা বসাক ভড় ▯ ২৩

সৈনিকের সম্মান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ▯ তরুণ বিজয় ▯ ২৭

বাংলাদেশে ব্লগার হত্যার নেপথ্যে ▯ ধীরেন দেবনাথ ▯ ২৯

জ্যোতিষশাস্ত্র স্বদেশে ব্রাত্য, ইউরোপ-আমেরিকায় পাঠ্য
▯ অশোক কুমার মণ্ডল ▯ ৩১

চিঠিপত্র : ১৯ ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯ **অন্যরকম : ৩৩** ▯ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৮**▯ **রঙ্গম : ৩৯** ▯ **শব্দরূপ : ৪০** ▯ **চিত্রকথা : ৪১**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

মুসলমানরা কি সত্যিই এদেশে বঞ্চিত?

সম্প্রতি ভারতের উপরাষ্ট্রপতি মহম্মদ হামিদ আনসারি মুসলমানরা বঞ্চিত বলে বক্তব্য রেখেছেন। উপরাষ্ট্রপতির মতো সাংবিধানিক শীর্ষপদের অধিকারীর এই বক্তব্য স্বাভাবিকভাবেই বিতর্ক ডেকে এনেছে। প্রশ্ন হলো, এদেশে মুসলমানরা কি সত্যিই বঞ্চিত? এই প্রসঙ্গে লিখেছেন অমলেশ মিশ্র ও কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী।

দাম একই থাকছে — দশ টাকা।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

এক পদ এক পেনশন : কেন্দ্রের প্রশংসাযোগ্য ঘোষণা

সম্প্রতি সেনাবাহিনীর স্পেশাল ফোর্সের কমান্ডো ল্যান্স নায়েক মোহননাথ গোস্বামীর আত্মত্যাগের কথা প্রকাশিত হইয়াছে। দশ দিনে এগারোজন পাকিস্তানি জঙ্গিকে খতম করিয়া তিনি শহীদের মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। বস্তুত শুধু মোহননাথ নন, সেনাবাহিনীর জওয়ান হইতে বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মী প্রতি মুহূর্তে নীরবেই এমন সাহস, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের সাক্ষ্য রাখিয়া যাইতেছেন। এইভাবে ১৩ লক্ষাধিক সেনা সীমান্ত রক্ষা না করিলে আমরা দেশবাসী নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে পারিতাম না। অথচ পেনশনের ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত সেনারা অন্যান্য চাকুরির তুলনায় অনেকটাই পিছাইয়া রহিয়াছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে, ১৯৭৩ সালের আগে সেনাবাহিনীতে 'এক পদ এক পেনশন' (ও আর ও পি) ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। তৃতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করিয়া ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র সরকার এই অসাম্যের ব্যবস্থাটি প্রবর্তন করে। স্বভাবতই গত চার দশক ধরিয়া অবসরপ্রাপ্ত সেনাদের মধ্যে বঞ্চনাজনিত ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইয়াছে। বর্তমানে সারাদেশে প্রাক্তন সেনার সংখ্যা ২৪ লক্ষেরও বেশি। 'ও আর ও পি'-র প্রত্যাবর্তনের দাবিতে তাঁহারা আন্দোলন শুরু করেন। ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের সময় প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদী প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, ক্ষমতাসীন হইলে তিনি প্রাক্তন সেনাদের এই দাবিটি পূরণ করিবেন। সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেনাকর্মীদের জন্য 'এক পদ এক পেনশন' নীতি ঘোষণা করিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রতিরক্ষাবাহিনীর কর্মীদের অবদানের প্রতি মর্যাদা দিতেই এক পদ এক পেনশন নীতির ঘোষণা। কেন্দ্রীয় সরকারের এই ঘোষণা প্রশংসার দাবি রাখে। এই দাবিতে দিল্লীতে প্রাক্তন সেনাকর্মীরা যে আন্দোলন করিয়াছিলেন রাহুল গান্ধী সেই দাবির সমর্থনে নানা কথা বলিয়াছিলেন। আজও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ কে অ্যান্টনি, কপিল সিবাল নানা কথা বলিতেছেন। অথচ ক্ষমতায় থাকাকালে কংগ্রেস সেনাকর্মীদের এই দাবিকে সমর্থন করে নাই। সেনাকর্মীদের দাবি সেদিন নস্যাৎ করা হইয়াছিল। বেঙ্কাইয়া নাইডু এই জন্যই বলিয়াছেন, 'কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় ছিল তখন দায়িত্ব পালন করিতে পারে নাই। এখন রাজনৈতিক স্বার্থে সমালোচনা করিতেছে।' অক্ষম অপদার্থ ব্যক্তিরা নিজেরা কিছু করে না, করিতে পারে না। অন্যেরা কিছু করিলেই কেবল খুঁত বাহির করা এবং সমালোচনা করিয়া থাকে। আজ কংগ্রেস তাহাই করিতেছে। কংগ্রেস এখনও আগাম অবসরের বিষয়টি লইয়া অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রধানমন্ত্রী এই জন্যই বলিয়াছেন 'এক পদ পেনশন লইয়া সমালোচনা করিবার অধিকার কংগ্রেসের নাই, কারণ তাহারা এই ব্যবস্থা চালু করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। তাঁহার সরকারই প্রথম এক পদ এক পেনশনের প্রতিশ্রুতি পূরণ করিয়াছে।'

উল্লেখ্য, বিজেপি-র ইস্তাহারে এই দাবি ছিল বলিয়াই মোদীকে প্রধানমন্ত্রী করিতে দেশের অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীরা সচেষ্ট ছিলেন। বিজেপিও এই সেনাকর্মীদের যথাসাধ্য মর্যাদা দিয়াছে। নরেন্দ্র মোদীর মন্ত্রীসভাতেও সেনাকর্মীদের দুই সদস্য রহিয়াছেন। কংগ্রেস কিছু সেনাকর্মীদের উস্কানি দিয়া যে আন্দোলনের সূচনা করিয়াছিল সরকারি এক পদ এক পেনশন নীতি ঘোষণার পর কংগ্রেসের ভূমিকা হাস্যকর হইয়া গিয়াছে। 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' হইয়া কংগ্রেসের ভূমিকা অন্যান্য বিরোধীদলের কাছেও অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। সমাজবাদী নেতা মুলায়ম সিং যাদব তো বলিয়াই দিয়াছেন, কংগ্রেসের ভুল নীতির জন্যই মানুষ বিজেপি-কে ক্ষমতায় আনিয়াছে।

কেন্দ্র সরকারের এই ঘোষণা প্রশংসনীয় হইলেও একটি বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন। অবসরপ্রাপ্ত সেনাদের এই প্রাপ্তির নজির হাতিয়ার করিয়া সরকারের অন্যান্য বিভাগগুলিতে এই দাবি উঠিতে পারে। সেনার সহিত অন্য বিভাগগুলির পার্থক্যটি অনুধাবন করিয়া এই সংকীর্ণ ভাবনা পরিহার করা উচিত।

সুভাষিতম্

নাভিষেকো ন সংস্কারঃ সিংহস্য ক্রিয়তে বনে।
বিক্রমার্জিতসত্ত্বস্য স্বয়মেব মৃগেন্দ্রতা।।

সিংহকে রাজা হওয়ার জন্য কোনো অভিষেক বা সংস্কারের প্রয়োজন হয় না। নিজের পরাক্রমের বলেই সে পশুদের রাজা হয়।

আনসারি বোঝালেন তিনি ভারতের উপরাষ্ট্রপতি নন, মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি।। টানা দু'বার উপরাষ্ট্রপতি পদে মনোনীত হামিদ আবদুল আনসারি তাঁর দ্বিতীয়বারের মেয়াদের অর্ধেকেরও বেশি সময় পার করে বুঝিয়ে দিলেন তিনি আজও নিজেকে বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের (পড়ুন মুসলিম) মানুষ হিসেবে

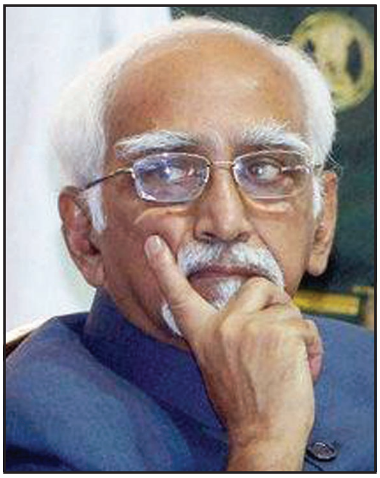

হামিদ আনসারি।

দেখতেই পছন্দ করেন। ভারতীয় সত্তা তাঁর মধ্যে এতটাই ক্ষীণ। গত ৩১ আগস্ট নতুন দিল্লীতে একটি অনুষ্ঠানে তিনি মন্তব্য করে বসেন যে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র- ক্ষমতায় যাঁরা থাকেন তাঁরা দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে 'অবদমিত, বর্জিত এবং পৃথক' (এমনকী নিরাপত্তা দিতেও অক্ষম) করে রাখেন। এর পরে তাঁর মন্তব্য— এই 'রাষ্ট্রনীতি' পালটাতে হবে। এর জন্য দ্রুত ও কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। একই সঙ্গে বর্তমান সরকারের 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ' (সবার সাথে, সবার উন্নয়নে) নীতির প্রতিও কটাক্ষের সুর শোনা গিয়েছে তাঁর গলায়। আনসারির বক্তব্য, 'এর সরকারি উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু এটা শুরুর জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে সুদৃঢ় পদক্ষেপ আগে থেকেই গ্রহণ করা দরকার এবং সর্বক্ষেত্রে এব্যাপারে সামর্থ্যেরও প্রয়োজন।' সব মিলিয়ে দেশের বর্তমান উপরাষ্ট্রপতি ঠারে-ঠোরে এটাই বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন যে দেশে মুসলমানরা এখনও অবধি যে সব সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন তা যথেষ্ট নয়, তাদের আরও সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে।

আনসারির এই মনোভাবে স্বাভাবিক ভাবেই দেশের রাজনৈতিক মহলে সমালোচনার তীব্র ঝড় উঠেছে। যে 'রাষ্ট্রনীতি' এই মুহূর্তে দেশের উপরাষ্ট্রপতির নিন্দার বস্তু, সেই 'রাষ্ট্রনীতি'র একজন অংশীদার তো ভারতবর্ষের উপরাষ্ট্রপতিও। সুতরাং এই পদে থাকার আর নৈতিক অধিকার তাঁর রয়েছে কিনা সঙ্গতভাবেই সে প্রশ্ন উঠেছে। তার থেকে বড়ো কথা ভারতবাসী হিসেবে না ভেবে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে বিবেচনা করে তিনি উপরাষ্ট্রপতির শপথ বাক্য তথা দেশের সংবিধানকেও অপমান করেছেন বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুরেন্দ্র জৈন বলেছেন, 'আনসারি সাহেবের বক্তব্যে একজন মুসলমান রাজনৈতিক নেতার বক্তব্যই প্রতিফলিত হয়েছে। এতে উপরাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের কোনো উপকার হবে না। উপরাষ্ট্রপতি পদের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা রেখে আমরা তাঁর এই সাম্প্রদায়িক বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করছি।'

বিজেপি-র জাতীয় মুখপাত্র সম্বিৎ পাত্র এই প্রেক্ষিতে বলেছেন, 'ভারতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোনো প্রভেদ করা হয় না। এই দুই সম্প্রদায়ই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজ করছে।' সুরেন্দ্র জৈনের অভিমত হলো, 'এই ধরনের মন্তব্য করে আনসারি আসলে মুসলমান সম্প্রদায়ের অসন্তুষ্টির পারদটাকেই আরও বৃদ্ধি করতে চেয়েছেন। তাঁর অবশ্যই জানা উচিত ভারতে মুসলমানরা যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা পান, হিন্দুদের কপালে তার ছিটে ফোঁটাও জোটে না। আবদুল হামিদ আনসারির মন্তব্যে যে ভারতবর্ষের উপরাষ্ট্রপতির পদমর্যাদাই ক্ষুণ্ণ হয়েছে এ বিষয়ে সব মহলই একমত।

সঙ্ঘের সমন্বয় বৈঠক অনুভব আদান প্রদানের জন্য : দত্তাত্রেয় হোসবালে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। নয়া দিল্লীতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সমন্বয় বৈঠককে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অংশগ্রহণ করাকে

কেন্দ্র করে বিরোধী রাজনৈতিক মহল তেতে উঠেছে। এ বিষয়ে সঙ্ঘের অন্যতম সহ সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে জানিয়েছেন, সঙ্ঘের সমন্বয় বৈঠকে বিবিধক্ষেত্রে যেসব স্বয়ংসেবক দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন তাঁরা মাঝে মাঝে একত্র মিলিত হন, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়, ভাবের আদান প্রদান হয়, তাঁরা যে যে ক্ষেত্রে কাজ করছেন তার অনুভব বর্ণনা করেন। এটা একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। তিনি বলেন, সমন্বয় বৈঠক কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার বৈঠক নয়, কাউকে কোনো কৈফিয়ত দিতে হয় না। দেশে কার সরকার চলছে তার ভিত্তিতে সঙ্ঘকাজ চলে না, সঙ্ঘকাজ সমাজের শক্তিতে চলে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

সংবাদ প্রতিবেদন

আই এস-এর নজরে পশ্চিমবঙ্গে হাওড়াসহ ভারতের বেশ কিছু রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আই এস জঙ্গিগোষ্ঠীর নজরে এবার ভারত। ভারতের পাঁচটি রাজ্য এবং সেইসব রাজ্যের ছয়টি শহরকে বেছে নিয়েছে তারা। ভারতে সরকারের নজরে কিছু আই এস প্রভাবিত জঙ্গি থাকলেও সোশাল সাইটে তাদের কাজকর্ম সেভাবে নজরে আসেনি। বর্তমানে ১৬ থেকে ৩০ বছর বয়সী ভারতীয় মুসলমান যুবক যুবতীদের আই এস জঙ্গিরা দলে টানতে পরিকল্পনা করছে বলে জানা যায়। ভারতে যে সন্ত্রাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে চাইছে আই এস তার পুরো কাজটাই সোশাল নেটওয়ার্কিং সাইটকে কাজে লাগানো হচ্ছে বলে অনুমান ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির। সূত্র মারফত জানা যায়, প্রথম পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে রয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর, অসম, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিমবঙ্গ। এছাড়াও ৬টি শহরের মধ্যে রয়েছে শ্রীনগর, গুয়াহাটি, চিঞ্চওয়াড়, মুম্বই, হাওড়া এবং উন্নাউ। ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির তথ্যে উঠে এসেছে যেসব শহরে আই এস ত্রাস সৃষ্টি করতে চাইছে তার মূল কেন্দ্র করা হচ্ছে মুম্বইকে এবং সেখান থেকেই এই সমস্ত শহরগুলিতে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সন্ত্রাসের বীজ। জানা যায়, ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব এবং গুগুলকে কাজে লাগিয়ে যুবক যুবতীদের দলে ভেড়ানোর চেষ্টায় আছে আইএস। গত মাসে এই নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ডাকা বৈঠকে ১২টি রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং ডিজিপি-রা হাজির ছিলেন। আই এস-কে রুখতে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে সে ব্যাপারেই আলোচনা হয়। পাশাপাশি অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় উত্তরপ্রদেশের বেশকিছু শহর আই এস জঙ্গিগোষ্ঠীর নজরে যে রয়েছে তা সোশাল মিডিয়ার অনলাইনে তাদের প্রচার থেকেই উঠে এসেছে। তবে চিন্তার ভাঁজ পশ্চিমবঙ্গের কপালেও। কারণ আই এস-এর নজরে হাওড়া থাকায় নড়ে চড়ে বসতে হচ্ছে এবার এ রাজ্যের সরকারকেও।

সোশাল মিডিয়ার সমীক্ষা চালিয়ে যে নাম উঠে এসেছে

রাজ্য	শহর
(১) জম্মু-কাশ্মীর	(১) শ্রীনগর
(২) অসম	(২) গুয়াহাটি
(৩) উত্তরপ্রদেশ	(৩) উন্নাউ
(৪) মহারাষ্ট্র	(৪) চিঞ্চওয়াড়
	(৫)মুম্বই
(৫) পশ্চিমবঙ্গ	(৬) হাওড়া

আমেরিকাকে আঘাত হানতে আইসিস-এর মুদ্রা প্রচলন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। 'দ্য রাইস অফ খিলাফত অ্যান্ড দ্য রিটার্ন অফ দ্য গোল্ড' শীর্ষক ভিডিওটির মাধ্যমে স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুতকারী টাঁকশাল খোলার কথা ঘোষণা করলো বিশ্বের সবচেয়ে ধনী সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আইসিস। তাদের এই প্রয়াসকে ৯/১১-এর পর পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রতি দ্বিতীয় আঘাত বলে অভিহিত করেছে। আইসিস প্রবর্তিত মুদ্রাগুলির একপিঠে শরিয়ত আইন অনুসারে মনুষ্য বা পশুপাখি বর্জিত কেবলমাত্র ইসলামিক চিহ্ন এবং অপর পিঠে আল্লাহ-র আশীর্বাদস্বরূপ তার প্রতীকীচিহ্ন সাতটি গমের ডগা অঙ্কিত থাকবে। মধ্যযুগীয় আরবে প্রচলিত দিনারের যুগ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এই সন্ত্রাসবাদী সংগঠনটি বিভিন্ন মূল্যের সোনা, রূপা ও তামার মুদ্রা তৈরি করবে। প্রসঙ্গত চুরি-ডাকাতি, তেল পাচার, জোর-জুলুম করে অর্থ আদায় ও মানবপাচারের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই আইসিস প্রভূত অর্থের মালিক হয়েছে।

পথ না, ফাঁদ?

নিজস্ব প্রতিনিধি।। পথ দুর্ঘটনা নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন, বড় বড় রাস্তার পাশে সুরক্ষা বিধি সম্বলিত হোর্ডিং এবং টিভিতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার পরও ভারতে পথ দুর্ঘটনা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক প্রকাশিত সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ২০১৪-তে ১৫ থেকে ৩৪ বছর বয়সী ৭৫, ০০০ জন মানুষ পথদুর্ঘটনার বলি হয়েছেন। এদের মধ্যে আবার ৮২ শতাংশই পুরুষ। ওই বছরই পথ দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে ৫৩.৪ শতাংশ হলো ১৫-৩৪ বয়ঃসীমার অন্তর্গত। ওয়ার্ল্ড হেল্থ অর্গানাইজেশনের হিসাবমতো বছরে ৩.৪ লক্ষ যুবক কেবলমাত্র মারা যাচ্ছে পথ দুর্ঘটার কবলে পড়ে। গাড়ি দুর্ঘটনার সংখ্যা ২০১৩ (৪.৮৬ লক্ষ) এর থেকে ২০১৪-তে সামান্যই বৃদ্ধি পেয়েছে (৪.৮৯ লক্ষ)। দুর্ঘটনায় বীভৎসতার পরিমাণও বেড়েছে ১.৫ শতাংশ হারে।

রেল দুর্ঘটনায় স্বয়ংসেবকদের উদ্ধারকাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মধ্যপ্রদেশে ট্রেন দুর্ঘটনায় উদ্ধার কাজে নামে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা। গত ৪ আগস্ট মধ্যপ্রদেশের হরদায় কামায়নি এক্সপ্রেস ও জনতা এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনায় ২৯ জন যাত্রীর মৃত্যু ও ৩০০-র অধিক আহত হয়। দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে দৌড়ে যায় স্থানীয় ২৫০ জন স্বয়ংসেবক। এরপর তারা উদ্ধারকাজে হাত লাগায়। মৃতদেহ উদ্ধার করা থেকে আহতদের হাসপাতালে পাঠানো সবই তারা অতি দ্রুততার সঙ্গে করে।

ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার একই : ভাইয়াজী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পাকিস্তান ও বাংলাদেশ অখণ্ড ভারতের অঙ্গ। ১৯৪৭-এর আগে দুই দেশ ভারতেরই অঙ্গ ছিল। সকলের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার (কালচারাল হেরিটেজ) একই। একথা স্মরণে রেখে চলতে হবে। গত ৬ সেপ্টেম্বর কলকাতায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের গুরু গৈরিক পতাকার পূজা অনুষ্ঠানে একথা বলেন সরকার্যবাহ শ্রী সুরেশ যোশী যিনি ভাইয়াজী নামেই সুপরিচিত। তিনি বলেন, সংবিধান রচনা হওয়ার পর ১৯৫২ সালে দিল্লীর লালকেল্লার প্রাকার থেকে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বলেন, আমরা ১০০০ বছরের পর স্বাধীন হয়েছি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যুদ্ধ জয়ের পর ইন্দিরাজীও অনুরূপ কথা বলেছিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে আমরা কাদের গোলাম হয়েছিলাম? শ্রী ভাইয়াজী আরও বলেন, দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র রক্ষার কথা বলা রাজনীতি নয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্যার কথা তুলে ধরা রাজনীতি? সঙ্ঘ রাজনীতি থেকে দূরে নয়। কেননা দেশ ও জাতির স্বার্থের সঙ্গে তা জড়িত। আজ রাজনীতির নতুন পরিভাষা দিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে। সঙ্ঘ এক স্বচ্ছ সমাজ জীবন নির্মাণের চেষ্টা করছে। তাই শুধু বলা নয়, করতেও হবে। অনুষ্ঠানের শুরুতে সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর কার্যবাহ শশাঙ্কশেখর দে গৈরিক পতাকাকে 'ভারত আত্মা'-র প্রতীক বলে বর্ণনা করে সকলকে স্বাগত জানান। মঞ্চে দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক অতুল কুমার বিশ্বাস ও কলকাতা মহানগর সঙ্ঘচালক সুশীল রায় উপস্থিত ছিলেন। সঙ্ঘের রীতি অনুযায়ী গুরু পূজা ও প্রার্থনার পর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

কেরল কমিউনিস্টদের মুখে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে'

সংবাদদাতা॥ কমিউনিস্টরা নাস্তিক ও জড়বাদী নামেই পৃথিবীতে পরিচিত। কিন্তু ইদানীং কেরল কমিউনিস্টদের মুখে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে' শুনে অনেকেই অবাক হচ্ছেন। গত শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর দিন

কেরলের কান্নুর জেলায় কমিউনিস্টরা শিশুদের কৃষ্ণ সাজিয়ে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করে গোকুলধামে পরিণত করেছিলেন। সূত্রের খবর, কেরলে কমিউনিস্টদের গড় হিসেবে পরিচিত কান্নুর জেলায় তাদের সংগঠনে ধস নেমেছে। হিন্দুবিরোধী ও নাস্তিক হওয়ার কারণে হিন্দুদের সমর্থন তাঁরা ক্রমেই হারাচ্ছেন। উল্লেখ্য, কেরলে 'বালগোকুলম্' নামে একটি সংগঠন কয়েক দশক ধরে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর দিন সারা রাজ্যে শিশুদের কৃষ্ণ সাজিয়ে নানা প্রকার অনুষ্ঠান পালন করে। এর ফলে ওই সংগঠন কেরলের জনমানসে এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। কান্নুর কমিউনিস্ট নেতৃত্ব অবশ্য জানিয়েছেন, তাঁরা জন্মাষ্টমী উৎসব পালন করেননি, ওনাম উৎসবের সমাপ্তি হিসেবেই কৃষ্ণ শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার শশীধরনের আশা, কমিউনিস্টরা এরকম পরম্পরাগত অনুষ্ঠান আয়োজন করায় রাজনৈতিক টানাপোড়েনে উত্তপ্ত কান্নুরে অবশ্য শান্তির পরিবেশ ফিরে আসবে।

Swachchha Bharat   Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

+ Low Cost readymade Latrine (Toilet) + Low Cost House
+ Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
+ Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71, Park Street, Kolkata - 700 016 (M) : 98311 85740, 98312 72657,

Visit Our Website : www.calcuttawaterproofing.com

মোদীর আসন্ন সিলিকন ভ্যালি সফরে বাধা দেওয়ার চেষ্টা চলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মার্কিন মুলুকে গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মোদীকে ভিসা না দেওয়ার জন্য যারা সেদেশে উঠে পড়ে লেগেছিলেন তাঁরাই এখন আবার ক্যালিফোর্নিয়ার বিশ্বখ্যাত সিলিকন ভ্যালিতে প্রধানমন্ত্রী মোদীর আসন্ন সফর নিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এ নিয়ে তারা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শুরু করেছে। যদিও বামপন্থীদের ব্যাঙ্গের জবাব দিতে মোদীর আগামী ২৭ সেপ্টেম্বরের ডিজিটাল ইন্ডিয়া সফরকে যে কোনো মূল্যে সফল করতে মোদী অনুগামীরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি ১২০ জনের তথাকথিত উদারবাদী বুদ্ধিজীবীদের একটি দল বিশ্বখ্যাত গুগল, অ্যাপেল বা টেসলার মতো বিশাল বহুজাতিক কোম্পানীগুলির কর্তাদের কাছে চিঠি লিখে জানিয়েছে যে মোদীর ভারতের সঙ্গে কোনো দীর্ঘস্থায়ী ব্যবসায়িক বন্ধনে যাওয়ার আগে তারা যেন সতর্ক থাকেন। এঁদের লেখার বিষয়বস্তু অনুযায়ী ভারতের বর্তমানে শাসকদল ও তার কর্ণধার ইতিমধ্যেই গণতান্ত্রিক অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন। তারা মানবাধিকার বা গণতান্ত্রিক অধিকারকেও অনেক সময় মর্যাদা দেয়নি। এমনকী নানান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলির স্বাধিকারেও হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করছে। প্রসঙ্গত এই

আবেদনপত্রের স্বাক্ষরকারীদের অধিকাংশই ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান শিক্ষাবিদ। এঁদের মধ্যে ওয়েন্ডি ডোনিগার, শেলডন পোলক-এর মতো আমেরিকান ভারততত্ত্ববিদ রয়েছেন যাঁদের ভারতীয় সংস্কৃতি বিরোধী লেখালিখি ও অবস্থান ইতিমধ্যেই অনেক জাতীয়তাবাদী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই বুদ্ধিজীবীদের অভিমত আনুযায়ী ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রযুক্তিগতভাবে চালু হয়ে গেলে নাগরিকদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সরকারের আওতায় চলে যাবে। এর জন্য কোনো রক্ষাকবচ সরকার রাখছে না বলে তাঁদের অভিমত। দেশের নাগরিকদের সমস্ত ব্যক্তিগত তথ্য সরকারের হস্তগত হয়ে গেলে তাদের ওপর নজরদারির সুবিধে হয়ে যাবে। এতে সংবিধান সংরক্ষিত নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে এমনটাই তাঁদের আশংকা এঁরা আরও বলেছেন যে সিলিকন ভ্যালীর বাসিন্দা হিসেবে ভারতের প্রতি তাঁদের একটা দায়বদ্ধতা রয়েছে।

অন্যদিকে দক্ষিণপন্থী বুদ্ধিজীবীরা এই অভিযোগকে পত্রপাঠ নস্যাৎ করে দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, তৎকালীন মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী কপিল সিবাল এই নজরদারির পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। অতীত কাজকর্মের খতিয়ান অনুযায়ী দাঙ্গাগুলির ক্ষেত্রে তদানীন্তন তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ সরকারগুলির ভূমিকা অতি হতাশাজনক। বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমগুলিতে লাগাতার মোদী বিরোধী ভূমিকা অবলম্বন করে তাঁকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টায় এই বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা আদতে বিদেশে ভারতের ভাবমূর্তির চরম ক্ষতি করছেন। তাঁরা এই মর্মে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

অবশ্য বামপন্থী বুদ্ধিজীবীর দল স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে ভারতের সঙ্গে ব্যবসার কারণে সিলিকনভ্যালির প্রভূত উন্নতি হয়েছে। আর সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর আমেরিকার সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্প্রসারণ করার প্রচেষ্টা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু অতীতে তাঁকে ভিসা না দেওয়ার কথাটিও যেন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি মাথায় রাখে বলে তাদের পক্ষ থেকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

স্তিমিত হবে প্যাটেলের আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্যাটেল সম্প্রদায়কে আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস (ওবিসি) তালিকাভুক্ত করার দাবিতে হার্দিক প্যাটেলের বিক্ষোভ আন্দোলনকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ প্রবীণ কংগ্রেস নেতা এবং চারবার গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন মাধব সিং সোলাঙ্কি। বিক্ষোভ প্রসঙ্গে বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গেই তিনি জানান যেহেতু এতে সত্যের কোনো স্থান নেই তাই এই আন্দোলন আপনা হতেই স্তিমিত হয়ে যাবে। একটি প্রথম সারির দৈনিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অশীতিপর শোলাঙ্কি জানান, 'ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী' পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর স্বার্থে সংরক্ষণের জন্য কাজ করেছি। একদা গুজরাটে ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে সমর্থন ছিল। ১৯৮৫-এর নির্বাচনে গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনে ১০৯টি আসনে ব্যাপক জয়যুক্ত হয়েছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত আমার দলের সহকর্মীরা সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলনে সাম্প্রদায়িক রঙ লাগায়। ফলত ঐতিহাসিক জয় পাওয়া সত্ত্বেও আমি পদত্যাগ করেছিলাম।' তবে এই পাতিদার বিক্ষোভের কারণ হিসাবে মূলত সংরক্ষণের সুযোগ নিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং চাকরিক্ষেত্রে ওবিসি সম্প্রদায়ের অন্যান্য সম্প্রদায়কে পিছনে ফেলে তর্‌তর্ করে এগিয়ে যাওয়ার ফলে উদ্ভূত ঈর্ষা বা অসন্তোষকেই দায়ী করা হচ্ছে।

জাতভিত্তিক সমাজ কাঠামোর উচ্চস্থানে অবলম্বনকারী ব্রাহ্মণ, প্যাটেল ও বানিয়ারা মূল জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ হলেও কখনও সংরক্ষণের আওতায় আসতে চাইলে 'লোয়ার কাস্ট'-এর জন্য আবেদন করতে হোত। আর এরা কখনই নিজেদের 'নিচালি জাত' হিসাবে গণ্য করতো না। বণিকপ্রধান গুজরাটে ১৯৮০-এর দশকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া ৮১টি শ্রেণীর জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণ উচ্চবর্ণ ছাত্ররা মেনে নেয়নি। পরবর্তী বছরগুলিতে রানে সরকার দ্বারা অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে সংরক্ষণের সুপারিশ করলেও সোলাঙ্কি সরকার তা খারিজ করে দেয়।

বর্তমানে ওবিসি তালিকা ২৭ শতাংশ বেড়ে ১৪৬-এ দাঁড়িয়েছে। ১৯৮০ এর নির্বাচনে খাম জোট (KHAM) ভেঙে দেওয়ায় ক্ষমতার কেন্দ্র প্যাটেল ব্রাহ্মণদের থেকে হস্তান্তরিত হয়ে ওবিসিদের হাতে। ১৯৮০-এর দশক থেকে গুজরাটে জাতভিত্তিক জোট গঠন করে নির্বাচন শুরু হয়।

বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটি কী পতনের মুখে?

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি দেশের তাবৎ প্রিন্ট ও বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমগুলি তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে ইন্দ্রাণী বোরা তথা দাস তথা মান্না তথা মুখার্জী নামের এক মহিলার বেপরোয়া জীবন যাপনের রগরগে খবরের ঢেউয়ে। ওয়াকিবহাল মহলে অনেকেই একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তুলছেন যা চমক-বিলাসী সংবাদমাধ্যমগুলি সযত্নে এড়িয়ে যাচ্ছে। তা হলো সেই ১৯৮৭ অর্থাৎ ২৮ বছর আগে নিজের বাড়িতে মেয়ের প্রথাসিদ্ধ বিয়ে না হওয়া সত্ত্বেও স্বামী-সহ বসবাস করার এবং অত্যন্ত দ্রুত ধারাবাহিকতায় দু'টি সন্তানের জন্মকেও পিতামাতার অবলীলায় মেনে নেওয়ার বিষয়টি। হ্যাঁ, ইন্দ্রাণী নাকি কামাখ্যায় বিয়ে করেছিলেন। তিনি বিবাহ নথিভুক্ত করেছিলেন কী? তাহলে এত কিছু যখন প্রকাশিত হচ্ছে সেই বিবাহের তথ্য কেন তাবড় সংবাদমাধ্যম প্রকাশ করে দিচ্ছে না। এখানেই প্রশ্ন আসছে উদারবাদী বুদ্ধিজীবীদের রুচিহীন ভূমিকার।

এখানে কিন্তু ইন্দ্রাণী কতবার বিবাহ করেছেন বা ধরা না পড়লে আরও করতেন কিনা সেটি বিচার্য নয়। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি অনুসারীরা ৭ বার বিয়ে করা ৫ সন্তানের জননী অভিনেত্রী এলিজাবেথ টেলরকে এ ব্যাপারে গুরু স্থানীয়া মনে করেন। বুদ্ধিজীবী মহলে প্রশ্ন আসছে বারবার এত লঘুভাবে বিবাহ কথাটি উল্লেখিত হচ্ছে যা ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে হয়ত ঠিক খাপ খায় না।

বিশ্লেষকরা বলছেন বিবাহ কী শুধুই পরস্পরকে সঙ্গদান করা নাকি একজনের জীবন যাপনের একজন ঘনিষ্ঠ সাক্ষী রেখে যাওয়া। অনেকে প্রশ্ন করছেন এটি অবশ্যই প্রেমকে চিরস্থায়ী করে যাওয়ার এক দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া। নাকি এটি কেবলই যৌনতা, অর্থ বা সমাজে প্রতিপত্তি অর্জনের চাবিকাঠি মাত্র। খুব সহজ অথচ সুন্দর একটি যুগান্তব্যাপী প্রবহমান ভারতীয় ভাষ্যও এই প্রসঙ্গে উঠে এসেছে। বিষয়টি সপ্তপদীর অঙ্গীকার। কি সুপ্ত রয়েছে বন্ধনে আবদ্ধ থেকে সাত সাতটি আবর্তনের মধ্যে। এটিকে শাস্ত্রীয় গোঁড়ামি না ভেবে উদারবাদী বুদ্ধিজীবীরা খোলামনে ভেবে দেখতে পারেন। সপ্তপদীর সারাৎসার (১) একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের সম্পর্ক বজায় রাখা (২) পারস্পরিক ভালবাসা ও বিশ্বাস (৩) আধ্যাত্মিক চিন্তার যুগ্মপূর্ণতাপ্রাপ্তি (৪) মনুষ্যত্ব সমন্বিত সন্তানের জন্মদান (৫) সুস্থ ও শান্তিময় জীবনযাপন (৬) জীবনপথের যাবতীয় আনন্দ বেদনাকে ভাগ করে নেওয়া (৭) সারাজীবনের যথার্থ বন্ধুর মতো সহযাত্রী হওয়া। একটি স্নিগ্ধতায় ভরা জীবনের প্রত্যয় এর মধ্যে দৃশ্যমান হয় বলেই পণ্ডিতদের অভিমত। এই পটভূমিতে ইন্দ্রাণীর বিক্ষুব্ধ ও অপরিতৃপ্ত বিবাহিত জীবনটি ময়ানতদন্ত করলেই উদারবাদীরা বৈপরীত্য টের পাবেন। একা ইন্দ্রাণীকে দায়ী করলে দায় ঝেড়ে ফেলা যায় না। তাঁর প্রথম স্বামী বা অংশীদার অত সহজে তাঁকে ছেড়ে যান কী করে। দ্বিতীয় স্বামী ডিভোর্স দেওয়ার পরও কিসের লোভে তথাকথিত শিনা খুনের সঙ্গী হন। কী আসক্তি চরিতার্থ করতে পিটার পূর্ণবয়স্ক সন্তান নিয়ে পুনর্বিবাহে জড়িয়ে পড়েন। অনেকেই বলছেন তাঁর পুত্র বা ইন্দ্রাণীর পুত্র তথা ভাই তাঁদের কাছ থেকে কোনো প্রতিবাদ এলে কি ঘটনাক্রম এই গতিতে চলত? উদারবাদী পথে আরও এগোনোর আগে আর একটু ভাববাদী ভারতীয় জীবনচর্চার কথা হয়তো ভাবার সময় আসছে।

নেতিবাচক সংবাদ রুখতে কিউ আর টি গঠন করছে কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ টিভি-র পর্দায় বিভিন্ন সংবাদ চ্যানেলে 'নেগেটিভ নিউজ' সম্প্রচার মোকাবিলায় বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তরের মধ্যে কুইক রেসপন্স টিম (কিউ আর টি) গঠনের পরিকল্পনা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। টিভিতে আলোচিত কোনো নেতিবাচক সংবাদ পরিবেশিত হওয়ার মাত্রই সে বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতেই এই কমিটি গঠন। মন্ত্রীসভার সচিব কর্তৃক আহুত এক বৈঠকে সমস্ত মন্ত্রক ও বিভাগকে সরকারি ও সরকার বহির্ভূত বিশেষজ্ঞদের ফোন নম্বর-সহ একটি তালিকা তৈরি করতে বলা হয়েছে। যাতে সরকারি কোনো বিষয় নিয়ে তর্কের সূচনা হলেই এই বিশেষজ্ঞরা সরকারের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। সকল মন্ত্রক অথবা বিভাগের প্রবীণ আধিকারিকগণ ছাড়াও প্রেস ইনফর্মেশন ব্যুরো-র নোডাল আধিকারিকগণ ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কিউ আর টি গঠিত হবে। এনডিটিভি, ইন্ডিয়াটিভি, এবিপি নিউজ, আজতক-কে শো-কজের নোটিশ ধরিয়ে দেওয়ার পর সারাদেশে যে আলোচনা সমালোচনার ঝড় বয়ে চলেছে তারই মাঝে প্রিন্ট মিডিয়ায় এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর দূরদর্শন পূর্বতন হাইকোর্টের বিচারপতি-সহ কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে ডেকে পাঠিয়েছিল বিশেষ প্রদর্শনের মধ্যে পার্থক্যগুলি কী, তা জানার জন্য।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, নেগেটিভ নিউজ-এর বিষয়ে কোনোরকম শিথিলতা দেখানো হবে না। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক অন্যান্য দপ্তরগুলির সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে টিভি নিউজ চ্যানেলে যে সমস্ত সংবেদনশীল সংবাদ পরিবেশন করা হবে, তার দ্রুত প্রত্যুত্তর দেওয়া হবে এই কমিটির কাজ। কালোটাকা, কোনো দাঙ্গা বা হিংসার ঘটনা অথবা এফ টি আই আই-এ নিয়োগের মতো বিষয়ে সরকারের নীতি দ্রুত স্পষ্ট করবে কিউ আর টি।

কংগ্রেসের নোংরা পরিষ্কারই বড় অভিযান মোদীর

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা,

আসুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আমরা সবাই মিলে ধন্যবাদ জানাই। এক পদ এক পেনশন দাবি মেনে নিয়ে দেশের জন্য লড়াই করা সেনাদের সম্মান জানানোর জন্য। একই সঙ্গে জানিয়ে রাখি সেনাবাহিনীর এই দাবি মেনে নিয়েই আপনার নিস্তার নেই। গুজরাটে হার্দিক প্যাটেলরা যে আন্দোলন শুরু করেছে তার যুক্তি মেনে নিয়ে সে সমস্যাও আপনাকে মেটাতে হবে। আসলে স্বাধীনতার পর থেকে ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে দেশে অনেক নতুন নতুন সমস্যা তৈরি করা হয়েছে। অনেক সমস্যাকে জিইয়ে রাখা হয়েছে। ভারত একটা গোটা দেশ কিন্তু সবার জন্য এক আইনটুকুও নেই। কংগ্রেসের অপরিণামদর্শিতার অনেক ক্ষতিপূরণ আপনাকে করতে হবে। কারণ, দেশবাসী বুঝতে পেরেছে এত দিনে যুক্তসঙ্গত দাবি যতটা সম্ভব মেনে নেওয়ার দিন এসেছে।

অনেকে ভাবতে পারেন মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পরই সেনাবাহিনীর এই সমস্যা তৈরি হলো। তা কিন্তু নয়। এই দাবি দীর্ঘ দিনের। বিষয়টা একটু বিস্তারিত বললেই বুঝতে পারবেন। সরকারি চাকরিতে কোনো কর্মী তাঁর শেষ পাওয়া বেতনের অর্ধেক পেনশন হিসাবে পেয়ে থাকেন। পরবর্তীকালে নতুন বেতন কমিশনের সুপারিশ মতো পেনশন বাড়ে। এই ব্যবস্থায় আগে অবসর নেওয়া উচ্চপদের সরকারি কর্মীর চেয়ে পরবর্তীকালে অবসর নেওয়া অপেক্ষাকৃত নীচু পদে কর্মরতদের পেনশন বেশি হয়। কারণ, যে কর্মী যত পরে অবসর নেন, তাঁর শেষ বেতন তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় পেনশনও বেশি পান তিনি। সরকারি ব্যবস্থায় এটাই দস্তুর। কিন্তু সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে এটা সমস্যার। আজ থেকে ১০ বছর আগে একজন কর্নেল অবসর নেওয়ার সময় যে টাকা পেনশন পেয়েছেন, এখন পদমর্যাদায় অনেক জুনিয়র এক জন নায়েব সুবেদার বা হাবিলদার হয়তো তার চেয়ে বেশি পেনশন পেয়ে অবসর নিচ্ছেন, যা সেনাবাহিনীর পদমর্যাদার প্রতি সম্মানহানিকর। তাই তাদের দাবি, একজন কর্নেল বা মেজর জেনারেল যখন অবসর নিন না কেন, তাঁকে সর্বশেষ অবসর নেওয়া কর্নেল বা মেজর জেনারেলের পেনশন দিতে হবে। অর্থাৎ, সারা দেশে একই পদে কাজ করা সমস্ত সেনা জওয়ান বা অফিসারের পেনশন এক হতে হবে।

স্বাধীনতার পর থেকেই সেনাবাহিনীতে এই প্রথা চালু ছিল। কিন্তু সমস্যাটা তৈরি করেছিল কংগ্রেস। বৃটিশ ভারতে সেনাদের সুযোগসুবিধা সাধারণ প্রশাসনের চেয়ে বেশি ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর তৎকালীন তিন বাহিনীর প্রধান কমান্ডার-ইন-চিফ জেনারেল কেএম কারিয়াপ্পা এই বাড়তি সুযোগ-সুবিধা না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর যুক্তি ছিল, স্বাধীন দেশে সেনাবাহিনী সাধারণ প্রশাসনের চেয়ে বাড়তি সুযোগ-সুবিধা নিলে বাহিনীর মধ্যে বৃটিশ ভারতের ঔপনিবেশিক চরিত্র বজায় থাকবে। তবে তখনও এক পদ এক পেনশন প্রথা ছিল। ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা কায়েম ছিল। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী সেই প্রথা তুলে দেন। তারপর থেকেই গত ৪০ বছর ধরে আন্দোলন করছে সেনাবাহিনী। একই সঙ্গে বীর সেনানীরা বৃদ্ধ বয়সে কষ্টের জীবন যাপন করেছেন। কেন্দ্রে একটা জাতীয়তাবাদী সরকার ক্ষমতায় আসতেই তারা বুঝতে পারেন হয় এবার, নয় নেভার। সেনাবাহিনীর প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার মতো কলজের জোর একজন আর এস এস স্বয়ংসেবকের থেকেই আশা করা যায়। তাই শুরু হলো আন্দোলন। তাতে ঘি দিতে গিয়েছিলেন রাহুল গান্ধী। তিনি তো আবার ভারত দূরে থাক নিজের পরিবারের ইতিহাসটাই জানেন না। তাঁর ঠাকুরমার তৈরি করা ফরমানেই যে এই দুর্ভোগ সেটা সম্ভবত রাহুলের মায়েরও জানা নেই। আন্দোলনরত সেনাকর্তারা অবশ্য রাহুলকে ঢুকতেই দেয়নি।

হায়, রাহুল ভেবেছিলেন একটা ইস্যু পাবেন, হলো না।

আন্দোলন শুরুর আগে থেকেই নরেন্দ্র মোদী এনিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ১৪ মাসের একটা সরকারের এটুকু সময় তো লাগবেই। কারণ, ভুললে চলবে না, ইতিমধ্যেই এমন এমন আর্থ-সামাজিক সংস্কার এই সরকার দেখিয়ে দিয়েছে যা সত্যি সত্যিই আম ভারতীয়র স্বপ্নে ছিল না। প্যাটেল আন্দোলনও সেই এক পটভূমি থেকেই তৈরি হয়েছে। তারাও বুঝেছেন এই সরকারকে যুক্তি সঙ্গতভাবে ভাবানো যায়। স্বাধীনতার এত বছর পরও শিক্ষা কিংবা চাকরিতে জাতভিত্তিক সংরক্ষণ যে লজ্জার সেটা নরেন্দ্র মোদী যে ভাবধারার মধ্য দিয়ে বড় হয়েছেন তার বড় শিক্ষা। সুতরাং সংরক্ষণ এবং জাতপাতের রাজনীতির বিরুদ্ধে বড় সংস্কারের পথে তিনি যে হাঁটবেন তা নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা নেই। তবে একটু সময় দিলে ভালো হয়। নরেন্দ্র মোদী স্বচ্ছতা অভিযানের ডাক দিয়েছেন। এ তো দেখছি কংগ্রেসের করা নোংরা মোছাই বড় কাজ।

— **সুন্দর মৌলিক**

গুরুদাসপুরের ঘটনা আবার মনে করিয়ে দিল সুরক্ষা বাহিনীর কঠোর নজরদারি ছাড়া গণতন্ত্র রক্ষা করা যাবে না

মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অঃপ্রাঃ)

ভারত ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীদের 'উফা' সম্মেলনে আলোচনায় স্থির হয়, উভয় রাষ্ট্র সন্ত্রাসবাদ দমনের উদ্দেশ্যে আলোচনায় বসবে। কিন্তু তারপর থেকেই পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণরেখায় গুরুতর অস্ত্র বিরতি লঙ্ঘন করে চলেছে। সেই সঙ্গে তারা আত্মঘাতী সন্ত্রাসবাদীদের ভারতে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটাচ্ছে। গুরুদাসপুরে থানা আক্রমণ করল, ভারতীয়দের রক্ত ঝরল, যদিও তিনজন সন্ত্রাসবাদীই নিহত হয়েছে।

কিন্তু কতজন কবে কোন পথে ভারতে অনুপ্রবেশ করতে সমর্থ হলো গোয়েন্দা তার কোনো অগ্রিম তথ্য জানতে পারল না। আমার মনে হয় এই বিষয়ে বিশেষ পর্যালোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ ভারতবাসী জানতে চায়, ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত এবং নিয়ন্ত্রণরেখা কতটা সুরক্ষিত এবং নজরদারি কতটা গভীর।

উধমপুরের সাধারণ নগরবাসীদের অভিনন্দন, তারা অন্তত একজনকে জীবন্ত ধরে ফেলতে সমর্থ হয়েছে এবং তাকে প্রশ্ন করে সমস্ত বিষয়ে তথ্য পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে এই দলটি কাশ্মীরের গুলমার্গ অঞ্চল দিয়ে বেশ কয়েক সপ্তাহ আগে অনুপ্রবেশ করে আত্মগোপন করেছিল এবং উধমপুরের কাছে বিএসএফ কনভয় উড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ পাওয়ার পর তারা ওই অঞ্চলে এসেছিল। ভাগ্যক্রমে সীমা সুরক্ষাবাহিনী একজনকে নিহত করতে সমর্থ হয়, শ্রীনগরের দিকে চলমান কনভয়ে হামলা করার সময়। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী এবং আই এস আই পাকিস্তানের সরকারকে কাশ্মীর এবং সীমান্ত সংঘর্ষ ও সন্ত্রাসবাদ নিয়ে মাথা গলাতে দিতে চায় না। যা করার তারাই করবে।

জামাত উল দাওয়া (জি ইউ ডি) এবং লস্কর-ই-তৈবা (এল-ই-টি)-র প্রধান হাফিজ সঈদ ও তার জেহাদিরা আই এস আই-এর সুপ্ত সৈন্যবাহিনী, তাদের বিষয়ে কোনো আলোচনায় পাকিস্তান বসুক তারা কখনই চায় না। এই সমস্ত সন্ত্রাস ঘটানো ও অস্ত্র বিরতি লঙ্ঘন করা হচ্ছে, যাতে ভারত এই আলোচনা রদ করে দেয়। যদিও ভারত সরকার ঘোষণা করেছিল, সন্ত্রাস বন্ধ না হলে কোনো শান্তি আলোচনা হবে না। তা সত্ত্বেও উভয় রাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ২৩ আগস্ট ভারতে আলোচনায় বসবেন বলে স্থির ছিল। যদি ভারত এই সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ও অস্ত্রবিরতি লঙ্ঘনের কারণে এই আলোচনা রদ করে দেয়, পাকিস্তান তখন সমস্ত বিশ্বকে জানাবে তাদের সর্বাত্মক প্রয়াস সত্ত্বেও ভারত শান্তি আলোচনায় আগ্রহী নয়। তবে পাকিস্তানি জেহাদি নাভেদ জীবন্ত, অক্ষত ধরা পড়ায়, পাকিস্তান আবার কাসবের (২৬/১১-র ঘটনা) ঘটনার মতো থমকে গিয়েছে। প্রথমেই তারা সোচ্চার হয়েছিল নাভেদ পাকিস্তানের নাগরিকই নয়, ভারতেরই নাগরিক এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী।

বালাকোট অঞ্চলে পাকিস্তান সাধারণ নাগরিকদের গ্রামে ১২০ মিলিমিটার মর্টার সেল ও মেসিনগান দিয়ে আক্রমণ করে চলেছে। অন্তত ছয়জন নাগরিক (মহিলা ও শিশু সহ) নিহত এবং ১০ জন আহত হয়েছেন। ভারত পাকিস্তানের হাই কমিশনার জনাব বাসিতকে ডেকে প্রতিবাদপত্র দিয়েছে। কিন্তু কোনো ফল হবে বলে মনে হয় না। বাসিত জানিয়েছেন, ভারতই গত একমাস যাবৎ অস্ত্রবিরতি লঙ্ঘন করে চলেছে। হাস্যকর অথবা ক্রন্দনযোগ্য কিনা বুঝতে পারছি না। বিগত দিনে ৭০ বার নাকি ভারত অস্ত্রবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করেছে! এটা পাক-হাই কমিশনারের দাবি।

ভারত উভয় রাষ্ট্রের নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের ২০ আগস্টের আলোচনা রদ করেনি, কিন্তু পাক সামরিক বাহিনী এখনও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে ভারত বীতশ্রদ্ধ হয়ে আলোচনা বন্ধ করে দেয়। তার কোনো লক্ষণ এখনও দেখা যায়নি। আরও একটা বিষয় বিশেষ করে লক্ষণীয়, কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখার তুলনায় জম্মুর বিপরীতে এবং পুঞ্চ রাজৌরী এলাকা দিয়ে অনুপ্রবেশের প্রয়াস পাকিস্তান বাড়িয়ে দিয়েছে। কিছুদিন আগেই সম্বার বিপরীতে পাকিস্তানের সীমান্ত ঘাঁটির নিকট থেকে একটা উন্নতমানের সুড়ঙ্গের হদিশ পাওয়া গিয়েছিল। আমার বিশ্বাস জম্মুর বিপরীতে এমন আরও কিছুসংখ্যক সুড়ঙ্গপথ তারা নির্মাণ করে ফেলেছে এবং সেগুলি এখন ব্যবহৃত হচ্ছে।

এই বিষয়ে সীমান্তে বিশেষ খোঁজাখুঁজির প্রয়োজন রয়েছে। মস্তগড় গ্রামের নিকট বিপাশা নদী পার করে ভারত ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ অন্যথায় সহজ নয়।

পাঞ্জাবের গুরুদাসপুরে সন্ত্রাসবাদীদের অনুপ্রবেশ একটা অস্বস্তিকর ঘটনা। ৮০ এবং ৯০-এর দশকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে পাঞ্জাবে সমস্ত পাক-ভারত সীমান্ত সুদৃঢ় করে গড়ে তোলা হয়েছিল। সমস্ত সীমান্তের সীমান্ত সুরক্ষাবাহিনী, সামরিক বাহিনী ও পাঞ্জাব পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে নজরদারি রাখতো। কিন্তু সেই পাঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদ শেষ হওয়ার পর নজরদারিও ঢিলেঢালা হয়ে গেছে বলে মনে হয়। অনেকের মতে ওই অঞ্চল দিয়ে কিছু সুরক্ষা

কর্মীর সাহায্যে তস্করি আরম্ভ হয়েছে। অন্যথায় দিনানগরে অত সহজে জেহাদি সন্ত্রাসবাদীরা অনুপ্রবেশ করে থানা দখল করে লড়াই করতে সমর্থ হোত না।

বিশ্বের জেহাদি সন্ত্রাসবাদের দিকে নজর দিলে বোঝা যাবে ভারতের কোনো অঞ্চলই এখন সুরক্ষিত নয়। ভারতকে তার সমস্ত জলসীমা এবং ভু-সীমান্তের উপর নজরদারি প্রখর করতে হবে। ভারতের বুরোক্রেসি সুরক্ষাবাহিনীর এইসব প্রয়োজনকে লঘু করে দেখার প্রয়াস করে থাকেন। আক্রমণ আসার পর হৈ হৈ করে কী হবে? আক্রমণ আসতে পারে যে কোনো সময়, যে কোনো দিক দিয়ে, বিশেষ করে যখন গোয়েন্দাবাহিনী আগাম সন্ত্রাসের তথ্য দিতে অপারগ, ভারতকে বেশ কয়েক বছর অস্ত্র-উপকরণ, সীমান্ত সড়ক ইত্যাদি বিষয়ে প্রস্তুত হয়েই থাকতে হবে। অন্যথায় দিনানগর, উধমপুরের মতো ঘটনা ঘটতেই থাকবে, বিশেষ করে পাক আই এস আই যখন খালিস্তানি সন্ত্রাস নতুন করে পাঞ্জাবে জাগিয়ে তোলার প্রয়াস করছে।

কাশ্মীরে ‘ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক সিরিয়া (আই এস আই এস)-র পতাকা দেখা যাচ্ছে। এটা আগামী দিনে কী হতে যাচ্ছে তার ইঙ্গিত মাত্র। কিন্তু ভারত সরকার এবং জম্মু-কাশ্মীর সরকার সেইসব পতাকাবাহীদের চিহ্নিত করে, গ্রেপ্তার করে, তারা কতদূর ভারত ভূখণ্ডে জাল বিস্তার করেছে, তার হদিশ, পাওয়ার কী প্রয়াস করছে তা আজও জানা যায়নি। এমনকী ‘দুখতারন মিলাত’ নেত্রী অন্দ্রাবিকেও গ্রেপ্তার করার সাহস দেখাচ্ছে না। সঈদ আলিশাহ গিলানিও সেল ফোনে হাফিজ সঈদের সভায় ভারত বিরোধী ভাষণ দিয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধেও কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অপারগ হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, যুক্তরাজ্য চিরকালই পাকিস্তান সম্পর্কে নিজেদের স্ট্র্যাটেজিক লাভ-লোকসান দেখবে। ভারত তাদের কাছে একটা বাজার মাত্র। অন্যথায় ‘লাকভি’র ক্ষেত্রে চীন রাষ্ট্রসঙ্ঘে ‘ভেটো’ প্রদান করত না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার দান করত না।

এমতাবস্থায় ভারতের সুরক্ষাবাহিনীকে কঠোরভাবে সম্পূর্ণ প্রস্তুতির সঙ্গে সীমান্ত এবং দেশের অভ্যন্তরে নজরদারি চালিয়ে যেতে হবে। ‘ইটারনাল ভিজিল ইজ দ্য প্রাইস অফ ডেমোক্রেসি’ অর্থাৎ গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে চিরন্তন নজরদারিই মূল্য হিসাবে দিতে হবে। প্রতিবেদন শেষ করার সময় জানা গেল, পাকিস্তান সুরক্ষা উপদেষ্টাদের আলোচনার আগে হুরিয়ত নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চান। ভারত জানিয়ে দিয়েছে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে এই আলোচনায় তৃতীয়পক্ষের কোনো স্থান নেই। কিন্তু পাকিস্তান অনড়, ভারতও তার জায়গায় অনড়। এমতাবস্থায় আলোচনা আদৌ হবে কিনা এখনও সন্দেহাতীত নয়। পাকিস্তানের সামরিকবাহিনী— আই এস আই আলোচনা থেকে পালিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজছিল, পথ বোধ হয় এবার তারা পেয়েছে।

সংযোজন : সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে আলোচনায় ভারত অনুমতি না দেওয়ায় পাকিস্তান একতরফাভাবে আলোচনা ভেস্তে দিয়েছে। ■

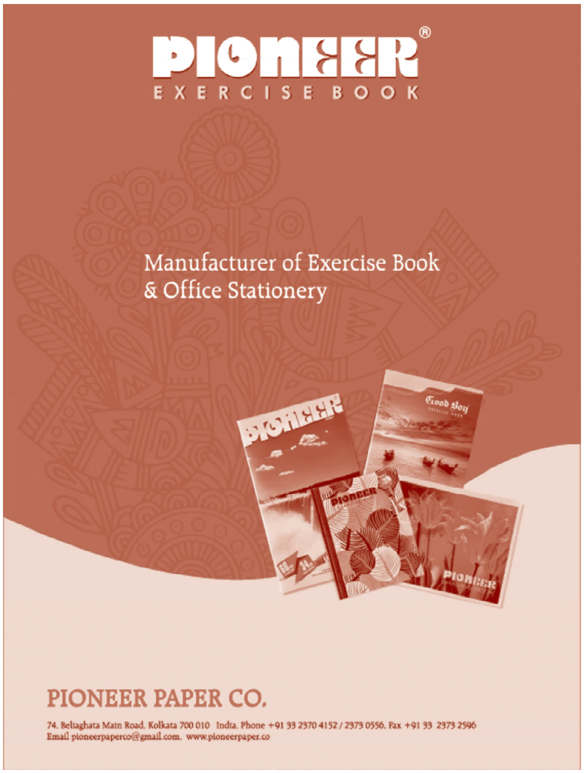

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

পাকিস্তান কি ভারতকে টেনে যুদ্ধে নামাবেই ?

দেবী প্রসাদ রায়

স্বাধীনতার পর থেকে পাকিস্তানের হিন্দুধর্ম অসহিষ্ণু প্রশাসন ও জনগণের এক বৃহদংশ ভারতের প্রতি বিদ্বেষাত্মক আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে বিরামহীন ভাবে। রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানেরই মদতে সন্ত্রাসবাদ ভয়াবহরূপে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তার দীর্ঘকালব্যাপী রক্তাক্ত শিকার হয়ে এসেছে ভারত।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহরুর চারিত্রিক দুর্বলতার জন্য পাকমদতপুষ্ট হানাদার বাহিনীর হাত থেকে আক্রান্ত কাশ্মীরকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করার মুহূর্তে যুদ্ধ বন্ধ করতে হয় অবিমৃষ্যকারী নির্দেশে এবং তাঁরই জন্য ভারতকে ভুগতে হচ্ছে ধনে-প্রাণে-মানে। কাশ্মীর যুদ্ধবিরতি রেখার ওপার থেকে ধারাবাহিক ভাবে গুলি চালনার শিকার ও ক্ষতিগ্রস্ত। দীর্ঘকাল ধরে ভারত সরকারের কূটনৈতিক প্রজ্ঞার অভাবে প্রঙ্গুত্বপ্রাপ্ত সামরিক ব্যবস্থার জন্য এপারের মানুষ ব্যতিব্যস্ত থেকেছে। ঠিক তেমনই ভাবে সমস্ত উত্তর ও উত্তরপূর্ব সীমান্ত জুড়ে চীন আক্রমণাত্মক থাকার কারণে উদ্বিগ্ন চিত্ত থেকেছে। কাশ্মীরের বৃহদংশকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়া এবং ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত তিব্বতকে চীনের হাতে তুলে দেওয়ার মাধ্যমে নেহরু সমস্ত ভারতকে বিপদাপন্ন করে রেখে গেছেন। চীন যুদ্ধে অপমানকর পরাজয়ের পর বিশ্ব পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে চীনের চারদিকে সামরিক ও কূটনৈতিক বলয় তৈরি করার সুযোগ থাকলেও কোনো প্রয়াসই নেওয়া হয়নি, যার জন্য চীনই সব দিক থেকে স্থলে এবং জলে ভারতকে ঘিরে ফেলার ব্যবস্থা নিয়েছে এবং নিচ্ছে। ১৯৬২ সালের পর চীনের সঙ্গে বৈঠকের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভারতের স্বার্থ বিরোধী অবস্থানকে দৃঢ় করে নিয়েছে চীন তার কূটনৈতিক তৎপরতায়। এর সঙ্গে ছিল চীনের বরাবরের অনুসৃত

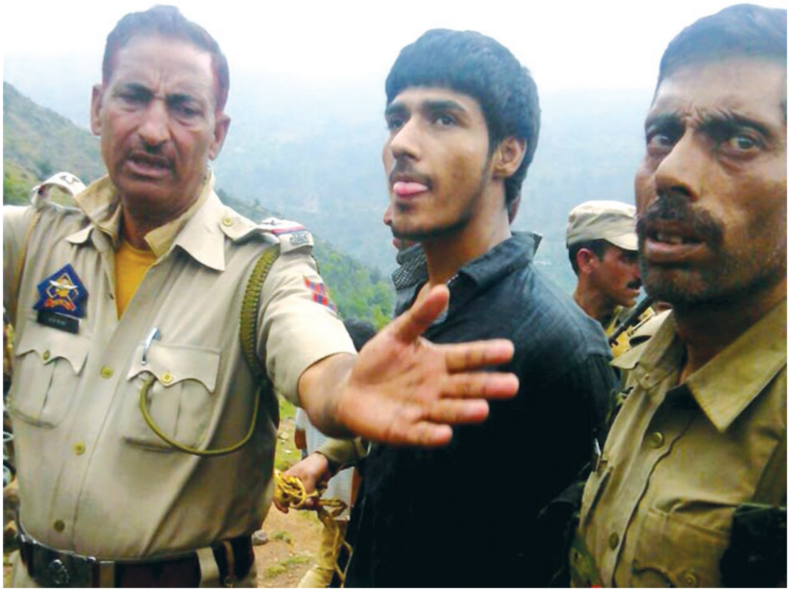

জম্মুর উধমপুরে বি এস এফ কনভয়ে হামলা চালানোর পর জীবন্ত ধরা পড়ে পাকিস্তানি জঙ্গি নাভেদ (উপরে)। দুই জঙ্গি সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকে পড়ে। একজন বি এস এফের গুলিতে মারা যায়। ধৃত জঙ্গি নাভেদ জানায় পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের মারতে ভারতে ঢুকেছে। সীমান্তে অনুপ্রবেশের অপেক্ষায় পাক-জঙ্গীর দল (নীচে)।

বিসমার্কীয় নীতি ''Settle everything with million byonets behind.''

চীন ভারতে নকসালদের, মাওবাদীদের, উত্তরপূর্বাঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী নাগাদের অস্ত্র সাহায্য করেই চলেছে আজ অবধি। পালটা যা করা যেত, করা উচিত ছিল ভারতস্থিত তিব্বতের অস্থায়ী সরকারের মাধ্যমে তিব্বতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সহায়তা করা— তা করেনি। তিব্বতকে কেন্দ্র করেই অরুণাচল-আগ্রাসন বাসনায় লাগাম টানা যেত --- তা করা হয়নি। কিঞ্চিদধিক চীনের হাতে তুলে দেন। চীন সিমলা কনভেনশন (ভারত তিব্বত চীন) মানেনি। সেই অনুসরণে পাকিস্তানও সিমলা চুক্তি মানছে না—মানছে না রাশিয়ায় হওয়া সাম্প্রতিক চুক্তিও। সীমান্তে গুলি চালনা চলছে চীন-পাকিস্তান যৌথ পরিকল্পনায়। ক্রমাগত উত্যক্ত করে ভারতকে যুদ্ধে নামাতে হবে। এবং তা হলেই যৌথ সামরিক প্রয়াসে কাশ্মীর চলে আসবে পাকিস্তানে এবং অরুণাচল চীনে। এবং এটাই উপযুক্ত সময়।

ভারতের দিকে তাক করা পাকিস্তানি অস্ত্র। মাঝে মাঝেই আছড়ে পড়ছে ভারতীয় সীমান্ত অঞ্চলে।

চারশোবার লাদাকে এবং অরুণাচলে চীনা সৈন্য অনুপ্রবেশ করেছে। ক্যাম্প করে থেকেছে— কী করে? চীনা সৈন্যদের মনে এই ধারণা দেওয়া হয়েছে যে এটা অনুপ্রবেশ নয়; স্বাভাবিক টহল নিজ এলাকায়। কোনো সশস্ত্র সংঘর্ষ, প্রতিরোধ হয়েছে? অন্য দেশই বা কী বলবে! এই ক্লীবনীতির জন্য ভারত হাস্যাস্পদ হয়নি কি? কোন দেশে এটা হয়? ভিয়েতনাম তো চীনের তুলনায় কতটুকু দেশ কিন্তু সেও তার মর্যাদা রক্ষা করেছে চীনকে প্রতিরোধ করে।

ভারত স্বাধীন হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। তিব্বত সীমান্তের ইয়াটুঙ অঞ্চলও ছিল মুক্ত ভারতে। চীনের দাবি করার আগেই তার টেলিফোন ব্যবস্থা-সহ ইয়াটুংকে নেহরু কেন?

পঞ্চমবাহিনী তৈরি হয়েই আছে। ভারতছাড় আন্দোলনের সময় এই বাহিনী একদিকে বৃটিশের দালালি করেছে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে। অন্য দিকে নেতাজীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে নেহরুর নেতাজী এলার্জিতে ইন্ধন জুগিয়েছে এই পঞ্চম বাহিনী, আবার চীনা আক্রমণের সময় চীনকে সমন্বয় করেছে। এর উপর পঞ্চম উপবাহিনীও তৈরি হয়েছে যারা মানবাধিকার হানির অভিযোগ করে ইয়াকুব মেমনের ফাঁসির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল। যে পঞ্চমবাহিনী পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিল সেই পঞ্চমবাহিনীর হয়েই এরা সোচ্চার হয়েছে।

এই পঞ্চম বাহিনী ও ষষ্ঠবাহিনীকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি সবাই। কারণ এরাই অতিসাম্প্রতিককালে দিল্লীর বৈঠকে পাকপ্রার্থিত হরিয়ত নেতাদের উপস্থিতিকে সমর্থন করেছে। ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথাগত রায় এই পঞ্চম উপবাহিনী সম্পর্কে সাবধান করে যথার্থ কাজই করেছেন।

সীমান্তে যে প্ররোচনা চলছে, যুদ্ধে নামতেই হবে কড়া কার্যকরী ব্যবস্থা হিসেবে। গ্রামবাসীদের মৃত্যু, ভারতীয় জওয়ানদের শহীদ হওয়া কি চলতেই থাকবে? তারা কি জন্ম থেকেই পাকিস্তানি সেনাদের জন্য 'বলিপ্রদত্ত'? কিছু ক্ষতিপূরণ ও ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকায় মুড়ে গার্ড অফ অনার দিয়েই কি ভারত সরকারের কর্তব্য শেষ? মৃত্যু মিছিল কি চলতেই থাকবে?

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবস্থা নিতে হবে। তার আগে এই পঞ্চম ও পঞ্চউপবাহিনী সম্পর্কে কড়া অবস্থান চাই। তথাগতবাবু সেই সতর্ক বাণীই উচ্চারণ করেছেন। দেশবাসী তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। পাকিস্তান ও চীন সম্পর্কে প্রো-অ্যাকটিভ ব্যবস্থা নিতে হবে। পাকঅধিকৃত কাশ্মীরকে মুক্ত করতে জনবাহিনী তৈরি করতে হবে এবং তিব্বতের মুক্তিসংগ্রামে সাহায্য করার পন্থাপদ্ধতি নিয়ে ভাবতে হবে। ভারতে অন্তর্ঘাত চালালে চীনে অন্তর্ঘাত চালানোয় সাহায্য করার বাধা থাকবে কেন?

দেশ চালানোর জন্য নেহরুর তথা কংগ্রেসের 'দিব্যজ্ঞান' প্রয়োগ দেখেছি আমরা; হারিয়েছি কাশ্মীর, বিপদাপন্ন করেছি অরুণাচল, আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত কৈলাস, মানস সরোবর।

এবার 'কাণ্ডজ্ঞানের প্রয়োগ' চাই। ২৩ জানুয়ারি কেন্দ্র ঘোষণা করুক নেতাজীর ছবি সামরিক বাহিনীতে রাখতে হবে। মোদী সরকার কী সেই কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দেবে? চীনের প্ররোচনায় পাকিস্তানের ধর্মান্ধ হঠকারি নেতৃত্ব পরমাণু বোমা প্রয়োগের হুমকি দিচ্ছে। সেটিও মনে রাখতে হবে, মোকাবিলা তদনুযায়ী করতে হবে।

■

> পুরনো শিল্পগুলির অবস্থান বেশিরভাগই শহরাঞ্চলে, ফলে সেখানে জমির দাম বেশি, তাই সেই জমি প্রোমোটারকে বিক্রি করে (অবশ্যই ঘুরপথে) লাভবান হচ্ছেন অনেক শিল্পপতিও (ভাগাভাগিতে রাজনীতিবিদরা)। সেই লাভের গুড় সমাধানের পিঁপড়ে খেয়ে যাবে এটা চান না তাঁরা কেউই।

রাজনীতির স্বার্থেই কি বন্ধ শিল্পের পতিত জমি ব্যবহার করা যাচ্ছে না?

অম্লানকুসুম ঘোষ

ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গপূর্ণ সমুদ্রের ন্যায় অর্থনীতির জগৎও নানাবিধ ঘাত-প্রতিঘাতে সদাচঞ্চল। অর্থনীতির সামগ্রিক চরিত্র এই ঘটনাগুলির এবং ঘটনা অভ্যন্তরস্থ বিষয়গুলির সমন্বয়ে গঠিত হয়। কখনও কখনও কোনো ঘটনা অন্য ঘটনাসমূহের চেয়ে প্রভাবের দিক দিয়ে বড় হয়ে ওঠে। তখন সামগ্রিক অর্থনীতির নিয়ন্তা হিসেবে সেই ঘটনাগুলির অন্তরালের বিষয়গুলিকে ব্যাখ্যা করা অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। সেরকম একটি ঘটনা হলো বর্তমান যুগে জমি-অধিগ্রহণ। শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ কীভাবে করা হবে তা নিয়ে জাতীয় ও রাজ্য রাজনীতিতে তরজা এখন তুঙ্গে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিল্প দরকার এবং শিল্প স্থাপনের জন্য জমি, সেই জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে আবার আঘাত লাগছে কৃষি ও কৃষকসমাজের গায়ে, যার ফলে অন্যদিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছে অর্থনীতির ভিত্তি। জমি নিয়ে দড়ি-টানাটানির এই অনন্ত আর্থ-রাজনৈতিক খেলার মাঝে মনে প্রশ্ন জাগে যে এর কোনো তৃতীয় সমাধান কি নেই যার ফলে কৃষক সমাজও ক্ষতিগ্রস্ত হলো না আবার শিল্পও তার প্রয়োজনীয় জমি পেল?

না, ভূতের রাজার দ্বারস্থ হওয়ার দরকার নেই। এর বাস্তব সমাধান আছে। অত্যন্ত ইতিবাচক সমাধানই আছে। যা রাজ্য রাজনীতির ক্ষেত্রে ও জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে সমান প্রাসঙ্গিক। আপাতত রাজ্য-আর্থ- রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সমাধানের যথার্থটা যাচাই করা যাক।

সমাধানটি হলো অব্যবহৃত জমি, পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে বন্ধ কলকারখানাগুলির যে জমি অব্যবহৃত পড়ে আছে তা নতুন শিল্প স্থাপনের কাজে লাগানো যেতে পারে। এইরকম জমির পরিমাণ কতটা এবং তা নতুন শিল্পের পক্ষে কতটা সম্ভাবনাপূর্ণ তা একবার পর্যালোচনা করা যাক। স্বাধীনতার পর-পরেই পশ্চিমবঙ্গ ছিল ভারতের সবচেয়ে শিল্পোন্নত রাজ্য। এই রাজ্যে সেই সময় পর-পর বেশ

কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত বা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বেসরকারি শিল্পের সৃষ্টি হয়েছিল। তৎকালীন শ্রমনিবিড় প্রযুক্তির জন্য এগুলিতে জমিও লেগেছিল প্রচুর। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এগুলির প্রযুক্তি বর্তমান সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে অক্ষম হয়েছে। ফলে বন্ধ ও পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে রয়েছে সবকটিই। তৎকালীন শ্রমনিবিড় প্রযুক্তির দ্বারা চালিত এই সব কারখানার জমির পরিমাণ এখনকার দৃষ্টিতে প্রচুর। এই জমিগুলি কাজে লাগানো যায় বর্তমান শিল্পের প্রসারে। তাতে লাভ নানাবিধ— এক, প্রচুর জমি একলপ্তে পেয়ে যাওয়ায় শিল্পমহলের জমির আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে সহজেই। দুই, এইসব পুরনো শিল্পসমূহের কর্মচ্যুত শ্রমিকবৃন্দ কিছু ক্ষতিপূরণ পাবে বর্তমান শিল্পমালিকদের কাছ থেকে। তিন, নতুন কর্মসংস্থান কিছু হবে। ঠিক কতটা পরিমাণ জমি এবং কোন জায়গায় অবস্থিত তার ওপর ভিত্তি করে একটি বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

গাড়ি শিল্প, তৎসংলগ্ন অনুসারী শিল্প এবং এতদ্বারা সৃষ্ট প্রচুর কর্মসংস্থান ও তজ্জনিত অর্থনৈতিক উন্নতি নিয়ে বর্তমানে সংবাদমাধ্যম তোলপাড়। পশ্চিমবঙ্গে গাড়ি শিল্পকে জমি দেওয়া নিয়ে বিবাদের জেরে একটি সরকারের পতনও প্রত্যক্ষ করেছে রাজ্যবাসী। তাই অতীতের বাতিল গাড়িশিল্প হিন্দমোটরের পতিত জমির ব্যাপারে প্রথমে আলোচনা করা যাক।

হিন্দমোটরের মোট জমির পরিমাণ ৪৮০ একর। উত্তরপাড়া ও কোন্নগরের মধ্যবর্তী খুব গুরুত্বপূর্ণ (যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক দু'দিক দিয়েই) জায়গায় এই জমিটির অবস্থান। ২০১১ সালে রাজ্য সরকার হিন্দমোটর কর্তৃপক্ষকে এই জমির অর্ধেক একটি বেসরকারি সংস্থাকে বিক্রি করার অনুমতি দেয়। জমি বিক্রি বাবদ প্রায় ২৫০ কোটি টাকা পায় হিন্দমোটর। যা থেকে রাজ্য সরকারের প্রাপ্য (হিন্দমোটর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে) টাকা মেটানোর কথা থাকলেও বর্তমানে বিবাদের জেরে ব্যাপারটি আদালতের আওতায়। কিন্তু বাকি ২৪০ একর জমি সহজেই দেওয়া যায় কোনো শিল্পসংস্থা এমনকী গাড়ি শিল্পসংস্থাকেও। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সিঙ্গুরে টাটার ন্যানো কারখানা গড়তে ২৫০ একর জমিরই প্রয়োজন ছিল, আর বাকি ৭৩০ একর জমি লাগত অনুসারী শিল্প হিসেবে। তৎকালীন রাজ্য সরকার এই ২৪০ একর জমি তাদের দিতে পারত, অনুসারী শিল্পের জমি তারা নিজেরাই খুঁজে নিত অন্য বন্ধ অনুসারী শিল্পের কাছ থেকে। টাটার প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গাড়ি শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় প্রচুর জলের যোগান হিন্দমোটর সহজেই দিতে পারত কাছেই গঙ্গা থাকায়।

গাড়ি শিল্পের কথা ওঠায় তার একটি বৃহৎ অনুসারী শিল্প গাড়ির বায়ুপূর্ণ চাকা তৈরির কারখানা সাহাগঞ্জের ডানলপের কথা মনে এল। দেশের এক সময়ের অগ্রণী ও বর্তমানে রুগ্ন এই মৃতপ্রায় প্রতিষ্ঠানটির আয়ত্তে আছে প্রায় ২০০০ একর জমি (বিভিন্ন জায়গা মিলিয়ে)। শহর থেকে অপেক্ষাকৃত দূরে (হিন্দমোটরের তুলনায়) হলেও, এই জমি পূর্বতন শিল্পের অবস্থিতির কারণে পরিকাঠামোর দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই জমিতে নতুন শিল্পতালুক গড়লে শুধু শিল্পেরই বিকাশ হয় না, কর্মচ্যুত ১২০০০ শ্রমিকের (স্থায়ী, অস্থায়ী ও নির্ভরশীল মিলিয়ে) কিছু অর্থনৈতিক সুবিধাও হয়।

কলকাতা (ভারতের একসময়ের রাজধানী ও এক সময়ের বাণিজ্যিক রাজধানী), হাওড়া (ভারতের সেফিল্ড), হুগলী (শিল্পোন্নত নদীকূলসমৃদ্ধ), উত্তর ২৪ পরগনা (কলকাতার শিল্প করিডোর) ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এরকম পরিত্যক্ত কারখানার সংখ্যা অনেক। কাজেই এক-একটি শিল্পকে ধরে আলাদাভাবে আলোচনা না করে সামগ্রিক পরিসংখ্যানের দিকে চোখ বোলানো যাক। সরকারি সূত্র অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে এইরকম জমির পরিমাণ ১৯২০০ একর, বেসরকারি মতে হিসেবটা আরও বেশি। শুধু সরকারি হিসেবমতো এগোলেই বোঝা যাবে যে এই জমির পরিমাণ বর্তমানে সরকারের ল্যান্ড-ব্যাঙ্ক বা জমি-ব্যাঙ্কের তুলনায় প্রায় তিন গুণ। এই পরিমাণ জমি একলপ্তে কাজে লাগিয়ে অর্থাৎ নতুন শিল্পসংস্থাকে ঘিরে যে পরিমাণ বিনিয়োগ আহ্বান করা যেত তার পরিমাণ প্রায় কুড়ি হাজার কোটি টাকা (ফিকি'র দেওয়া আনুপাতিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী)। বর্তমান পুঁজিনিবিড় শিল্পে এক কোটি টাকা বিনিয়োগে গড়ে এক জনের কর্মসংস্থান হয় বলে আশা করা যায় যে এর ফলে অন্তত কুড়ি হাজার লোকের কর্মসংস্থান হোত এবং এগুলির সঙ্গে যুক্ত বর্তমানে কর্মচ্যুত প্রায় দু' লক্ষ প্রাক্তন শ্রমিকের অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূর হোত। অনুসারী শিল্পগুলির অব্যবহৃত জমির কথা উপরিক্ত হিসেবে আসেনি, কারণ সেই জমির পরিমাণ পরিসংখ্যানগতভাবে আমাদের আয়ত্তাধীন নয়। একথা ঠিক যে এই অনুসারী শিল্পের মোট জমির পরিমাণ মূল জমির পরিমাণের চেয়ে বেশি হয়। কাজেই আলাদাভাবে অনুসারী শিল্পকে ধরলে, তা থেকে প্রাপ্ত বাণিজ্য ও তজ্জনিত আয় ও অর্থনৈতিক লাভ মূল শিল্পের চেয়ে অনেক বেশি হবে।

বাধাটা অন্য জায়গায়। এইসব বন্ধ কারখানার জমি, যাতে নতুন শিল্প বসানোর কথা ভাবা হচ্ছে, সেগুলির মালিক সরকার নয়, সেগুলির মালিক কোনো না কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। সেই প্রতিষ্ঠান (যতই

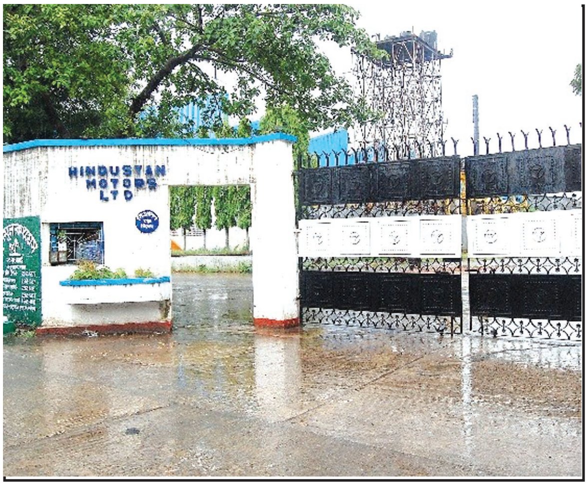

এক নজরে বন্ধ শিল্পের পতিত জমি

- **হিন্দমোটর—মোট জমি ৪৮০ একর— অব্যবহৃত জমি ২৪০ একর— বর্তমানে রুগ্ন।**
- **ডানলপ— প্রায় ২০০০ একর— বর্তমানে রুগ্ন।**
- **কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গে পরিত্যক্ত কারখানার সংখ্যা অনেক।**
- **সরকারি সূত্র অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে বহু শিল্পের পতিত জমির পরিমাণ ১৯২০০ একর, বেসরকারি মতে হিসেবটা আরও বেশি।**

রুগ্ন হোক না কেন) জমির অধিকার ছাড়তে নাও চাইতে পারে। এখানেই থাকবে সরকারের ভূমিকা, নিয়ন্ত্রকের। সরকার সেইসব বেসরকারি সংস্থার ওপর আইনগত চাপ (অবশ্যই নতুন আইন সৃষ্টি করে) দিতে পারে যে, হয় তোমরা জমির অধিকার সরকারের হাতে ছেড়ে দাও অথবা তোমাদের সংস্থায় নথিভুক্ত বর্তমানে কর্মচ্যুত শ্রমিকদের প্রাপ্য বকেয়া এবং অবসরকালীন অন্যান্য সুযোগসুবিধা এবং কর্মচ্যুতির জন্য এককালীন প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দাও। রুগ্ন সংস্থাগুলি স্বভাবতই এই বিপুল অর্থনৈতিক বোঝা স্কন্ধারূঢ় করতে চাইবে না (যা তারা ইতিপূর্বে বহুবার চায়নি)। ফলে পরিবর্তিত আইন অনুযায়ী তারা সরকারের হাতে তাদের হাতে থাকা জমি তুলে দিতে বাধ্য থাকবে। সরকার এই জমি বাজারদরে বিক্রি করবে দেশের অগ্রণী সংস্থাগুলিকে যারা নতুন শিল্প স্থাপনে আগ্রহী। এই বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে সরকার শ্রমিকদের যাবতীয় পাওনা মেটাতে পারবে। নতুন কোনো জমি নিয়ে (বিশেষত কৃষিজমি) শিল্পসংস্থাকে শিল্পের উপযুক্ত জমি তৈরি করে নিতে হয়। ফলে এককালীন খরচ হয়, সেখানকার পরিকাঠামো উপযুক্ত থাকে না, সেখানকার পরিবেশ সংক্রান্ত পরিবর্তন অনেক বাধা বয়ে আনে, সাধারণ শ্রমিকের কর্মশিক্ষার অভাব থেকে। সেগুলি দূর করতে তাদের অনেক উদ্যম ব্যয়িত হয়। কিন্তু পুরনো শিল্পের জমি অধিগ্রহণ করলে সেই জমিকে তৈরি করে নিতে হয় না, পরিকাঠামো উপযুক্ত থাকে। ও অন্যান্য বিষয় পূর্বতন শিল্পের কারণে শিল্পবান্ধবই থাকে এছাড়া স্থানীয় জনবিন্যাসে দক্ষ শ্রমিকের যোগান পাওয়া যায় সহজেই। এইসব সুবিধা একত্রে পেয়ে যাওয়ায় বন্ধ শিল্পের জমি কিনতে শিল্পপতিরা বাজার দরে অর্থব্যয় করতে পিছপা হবেন না। নতুন জমি নেওয়ার সময় যেমন বিনামূল্যে জমি দাবি করেন তা করবেন না। ফলে সরকারের বাজারদরে জমি বিক্রিতে কোনো সমস্যা হবে না।

এর ফলে অর্থনৈতিক লাভের একটু পরিমাপ নেওয়া যাক। বন্ধ কারখানার ছ' লক্ষ শ্রমিকের অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রায় কুড়ি হাজার নতুন কর্মসংস্থান। অনুসারী শিল্প মিলিয়ে সবসুদ্ধ প্রায় পাঁচ লক্ষ লোকের অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। অর্থনীতির সামগ্রিক ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে চাহিদা বাড়ে। ফলে উৎপাদন বজায় থাকে যা নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, নতুন করে চাহিদা বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নতির চক্রে অরোহণের সম্ভাবনা দেখা দেয় এই পতিত জমির সদ্ব্যবহারের ফলে। দ্বিতীয়ত, অর্থনীতির ভিত্তি (কৃষি) ও ভবিষ্যৎ (শিল্প)-এর মধ্যে দড়ি টানাটানি বন্ধ হয়ে অর্থনীতির সুসামঞ্জস্য বিকাশ ঘটে।

কিন্তু এই অর্থনৈতিক মহৌষধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে দু'টি বাধা বর্তমান। এক, রাজনৈতিক দলগুলি জমি অধিগ্রহণ এবং তৎসংলগ্ন বিষয়গুলি (যেমন শিল্পপতিদের জমি বণ্টন, পরিকাঠামোর বন্দোবস্ত ইত্যাদি) নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে হাওয়া গরম করে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে সদা তৎপর। কেড়ে নেওয়া, কেড়ে নেওয়া ঠেকানো ও পাইয়ে দেওয়া এই নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে রাজনৈতিক ঝড় তুলে নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক ভারী করাই তাদের লক্ষ্য। এরকমভাবে অতীতে সাফল্যও এসেছে তাদের। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম তারই জ্বলন্ত উদাহরণ। নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির ভূমিকে এভাবে সহজ সমাধানের মাধ্যমে হারাতে তারা কখনওই চাইবে না। দুই, বাজারদরে পুরনো শিল্পের জমি নতুন শিল্পপতিদের বিক্রি করার মধ্যে কোনো দুর্নীতির জায়গা থাকে না। দুর্নীতিজীবী রাজনীতিবিদের তাতে ভীষণ অসুবিধা। বরং শিল্পপতিদের বিনামূল্যে জমি (অধিগৃহীত) বিতরণ করার সময় টেবিলের তলার দেওয়া-নেওয়ায় লাভবান হন অনেক রাজনীতিবিদ। সেই লাভ ছাড়তে চাইবেন না তাঁরা কোনোমতেই। তিন, পুরনো শিল্পগুলির অবস্থান বেশিরভাগই শহরাঞ্চলে, ফলে সেখানে জমির দাম বেশি, তাই সেই জমি প্রোমোটারকে বিক্রি করে (অবশ্যই ঘুরপথে) লাভবান হচ্ছেন অনেক শিল্পপতিও (ভাগাভাগিতে রাজনীতিবিদরা)। সেই লাভের গুড় সমাধানের পিঁপড়ে খেয়ে যাবে এটা চান না তাঁরা কেউই।

অতএব পরিস্থিতি রীতিমতো ভয়ঙ্কর। তৃষ্ণার্ত এবং সুশীতল বারি পাশাপাশি বর্তমান। সমস্যা এবং সমাধান দু'য়েরই পাশাপাশি অবস্থান। কিন্তু কায়েমি স্বার্থ তাদের মেলবন্ধন ঘটতে দেবে না। কাজেই এখন প্রশ্ন দেশ ও জাতির অনাগত ভবিষ্যতের সামনে। তারা কোন পথ বেছে নেবে এবং কীভাবে? সমাধানের সহজ পথ যা অর্থনীতিকে দেবে নতুন উন্নয়নের সোপানের খোঁজ, না ব্যর্থতার জটিল পথের যা ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থের চোরাবালিতে ধ্বংস করবে সমষ্টির মহৎ ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে? যুগান্তকারী এই প্রশ্নের কোন্ উত্তর জাতি গ্রহণ করবে নিজের জন্য— তার ওপরই নির্ভর করছে সকলের আগামী দিন।

চিঠিপত্র

সংগঠিত হওয়াই বাঁচার পথ

কয়েকদিন আগে একটি দৈনিক সংবাদপত্রে জনৈক পত্রলেখক লিখেছিলেন যে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল নেহরুজীকে প্রশ্ন করেছিলেন--- ‘ভারতবর্ষ সাতশ/আটশ বছর মুসলমান শাসনে ছিল। কোনো হিন্দু বা আপনাদের দেশীয় রাজা বা সম্রাট যুদ্ধ করে তাদের হঠাতে পেরেছে কী? আমরা যদি আপনাদের দেশ থেকে চলে যাই তো আপনাদের দেশ আবার মুসলমানদের অধীনে চলে আসবে।’ কথাটা মিথ্যে বলেননি। বস্তুত বৃটিশ চলে যাওয়ার পর প্রায় ১/৩ অংশেরও বেশি হিন্দু মুসলমান অধীনে প্রায় অবলুপ্তির পথে। অবশিষ্ট ভারতে মুসলমানরা বকলমে রাজত্বে করছে। তাদের জন্য আলাদা আইন, তারা অন্যায় করলে পার পেয়ে যায়। প্রতিবাদ কেউ করে না--- কী নেতারা, কী জনসাধারণ। সত্যি কথা বলতে কী সাহস পায় না। উলটে তাদের বিরুদ্ধে সামান্য অন্যায় দেখলে সকলে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। তাদের ভোটের জন্য সকলে তোষণ করে। কারণটা আর কিছুই নয়, ধর্মের ব্যাপারে সমাজের ব্যাপারে ওরা সবাই এককাট্টা। ভয়েই হোক, বাঁচার তাগিদেই হোক, ওই ধর্মের সাধারণ লোকও ধর্মীয় অন্যায় দেখলেও চুপ করে থাকে। তাদের মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসন আছে। খৃষ্টানদের মধ্যেও ধর্মীয় অনুশাসন আছে। অপরপক্ষে হিন্দুদের মধ্যে না আছে সমাজবন্ধন, না আছে সামাজিক তথা ধর্মীয় অনুশাসন। যেটুকু আছে তা ভাঙতে সবাই উদ্যত। এখানে সবাই এক একজন সমাজ সংস্কারক বা ধর্মীয় নেতা। তারা একে অপরকে সহ্য করতে পারে না। সকলেই ভাল থাকতে বা ঝুট ঝামেলা এড়িয়ে থাকতে চায়। ধর্মীয় অনুশাসনকে ভণ্ডামী বা কুসংস্কার বলে মনে করে। তাই রাজনৈতিক নেতারা হিন্দুদের অনুভূতির কোনো তোয়াক্কা করে না। আমরাও কষাইখানার জীবের মতো শান্তশিষ্টভাবে জীবন ধারণ করতে চাই। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে।

এই অবস্থার পরিবর্তন ধরতে হলে চাই হিন্দুদের একতা। ভারতে ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ হিন্দু যদি একাত্মতা দেখাতে পারে তবেই ভারতবর্ষ এক থাকবে। আমরা যে রাজনৈতিক দলের সভ্যই হই না কেন, ভুললে চলবে না আমরা হিন্দু। হিন্দুরা সংগঠিত থাকলেই ভারতে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা থাকবে। জনসাধারণ শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। নচেৎ চার্চিলের কথাই সত্য বলে প্রমাণিত হবে।

—**কমল মুখার্জী,**
চুঁচুড়া, হুগলী।

‘যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি’

দুর্যোধনের ‘...যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি’ খেদোক্তির উৎস জানতে চেয়েছিলাম (চিঠিপত্র, ৩.৮.১৫)। ইতিমধ্যে তা পেয়ে গিয়েছি এবং সেই সঙ্গে আরও কিছু জেনেছি, যে কারণে এই পত্রের অবতারণা।

পুরাণের দশাবতার কথার সূত্রে রচিত ‘জাতীয় জীবনের ধারা’ পুস্তকের (পঞ্চম অধ্যায়) ‘দুর্যোধনের জীবনের রহস্য’ পরিচ্ছেদ থেকে জানা যায়— “গীর্বাণ সাহিত্যে ‘পাণ্ডব গীতা’ নামে ছোট ছোট শ্লোকের আদলে লেখা একটি কাব্যগ্রন্থ আছে। ভারত যুদ্ধের পর স্বর্গে কৌরব-পাণ্ডবদের সকলে একত্রিত হয়ে কথাবর্তার মধ্য দিয়ে নিজ নিজ জীবনের সার কথা বলছে, এই-ই কাব্যগ্রন্থটির মূল আখ্যান। ভারত যুদ্ধের ঘোর নরসংহারের জন্য যে দায়ী সেই দুর্যোধন নিজ জীবনের রহস্য কাহিনি বলতে গিয়ে এই কাব্যে বলেছে— জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ... যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।।” উল্লিখিত পুস্তকটির মূল রচয়িতা বাবাসাহেব আপ্তে অভিধায় বিশেষ পরিচিত সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রচারক প্রমুখ উমাকান্ত কেশব আপ্তে (১৯০৩-১৯৭২)। বাংলা অনুবাদক— অশোক দাশগুপ্ত; প্রকাশক— ভারতীয় সংস্কৃতি ট্রাস্ট।

—**বিমলেন্দু ঘোষ,**
কলকাতা-৬০।

সবার প্রিয়
®
বিল্লদা
চানাচুর

‘বিল্লদাকুঞ্জ’
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

অপরাধীদের সহজ শিকার শহরবাসী বৃদ্ধ দম্পতিরা

কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শংকর তাঁর একটি লেখায় বলেছিলেন, সেই হচ্ছে ভাগ্যবান যার শৈশব কাটে জাপানে, যৌবন আমেরিকায় এবং বার্ধক্য অতিবাহিত করে ভারতবর্ষে। এই কথা বলার অর্থ ভারতবর্ষের সমাজে প্রবীণ-প্রবীণাদের শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রম প্রদর্শন করা হয়। আগে ছিল যৌথপরিবার। ওই পরিবারের প্রবীণতম ব্যক্তি হতেন পরিবারের কর্তা। তাঁর উপদেশ, নির্দেশ মেনে সবাই চলত। কোনো পারিবারিক অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্রে পরিবারের প্রধানব্যক্তির নামই নিমন্ত্রণ কর্তা হিসাবে উল্লেখ থাকত। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা নিয়ে এগিয়ে চলত যৌথ-জীবনযাত্রা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত সরাসরি এসে আমাদের সমাজজীবনে লাগে। এরপর থেকে যৌথপরিবারে একটু একটু করে ভাঙন শুরু হয়। এইভাবে ভাঙতে ভাঙতে এসে বর্তমানে অণু- পরিবারে পরিণতি লাভ করেছে। তার সঙ্গে সেই দালানকোঠা বিশিষ্ট অট্টালিকাগুলির স্থানে অবির্ভূত হলো আধুনিক বহুতল আবাসন যার পোশাকি নাম ‘ফ্ল্যাট’। এই এক-কামরা, দু-কামরা বিশিষ্ট ফ্ল্যাটের মধ্যে বাঙালি চিত্তপ্রসাদ লাভ করতে সচেষ্ট হলো। আর এইখান থেকেই শুরু হলো আর এক অশান্তির। এসব ফ্ল্যাটে বর্তমানে এক সন্তান বিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যাই বেশি।

এই পরিবারের একমাত্র পুত্রসন্তান চাকরি বা উচ্চশিক্ষার্থে ভিন রাজ্য বা ভিন দেশে গমন করলে প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ দম্পতি তাঁর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের মধ্যে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। অন্যদিকে যখন একমাত্র কন্যা বিবাহের পর অন্যরাজ্য বা অন্যদেশে চলে যান তখন সেই দম্পতি ক্রমশ নিঃসঙ্গ এবং অসহায় বোধ করতে থাকেন।

আমাদের পাশ্চাত্য ঘেঁষা শিক্ষাব্যবস্থা এবং পাশ্চাত্য জগৎ থেকে বিভিন্ন মাধ্যম বাহিত হয়ে আসা জড়বাদী ভোগবাদী সংস্কৃতি আমাদের দীর্ঘলালিত সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতি-ভিত্তিক জীবনের উপর সাইক্লোনের মতো আছড়ে পড়ছে। এর প্রভাবে আমাদের শাশ্বত মূল্যবোধ, নীতিবোধ এবং আদর্শবোধের পরিবর্তন ঘটে চলছে। পাশ্চাত্য ভোগবাদী সংস্কৃতির মূলমন্ত্র মানুষকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া, মানুষ যাতে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক একটা দ্বীপের মতো অবস্থান করে।

সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির ধারণা এর বিপরীত। আমাদের সনাতন ধর্ম এবং সংস্কৃতি যৌথজীবনে বিশ্বাসী। পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সহমর্মিতার উপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সমাজজীবন।

ভারতে বৈদেশিক সংস্কৃতির আক্রমণে বিপন্ন মানুষজন আজ নানারকম সমস্যা ও সংকটের মুখোমুখি। গত ১৬ জুলাই কলকাতার পাইকপাড়াস্থিত ইন্দ্রলোক আবাসনের বাসিন্দা অধ্যাপক দম্পতি প্রাণগোবিন্দ দাস ও শ্রীমতী রেণুকা দাস আততায়ীর হাতে নৃশংসভাবে নিহত হন। একমাত্র গৃহপরিচারিকা তাঁদের দেখাশুনা করতেন। এই গৃহপরিচারিকার স্বামীর হাতেই নিহত হলেন অধ্যাপক দম্পতি। অর্থাৎ আততায়ী তাঁদের পরিচিত। গত দু’বছরে কলকাতায় এই ধরনের আটটি ঘটনা ঘটেছে সেখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আততায়ীরা আক্রান্ত ব্যক্তিগণের পূর্বপরিচিত কোনো ব্যক্তি। নগদ অর্থ, গহনা প্রভৃতির লোভে অপরাধ সংঘটিত করে চলে যাচ্ছে। তাহলে কোথায় যাবেন এই অসহায় নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ দম্পতিরা? তাঁরা কি তাঁদের স্বগৃহ ত্যাগ করে বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করবেন?

আমার অফিসের এক প্রাক্তন সহকর্মী তরুণীর সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। তিনি পিতামাতার একমাত্র কন্যা। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি জানালেন যে ছোটবেলা থেকেই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে বাড়ির অনতিদূরেই বিবাহ করবেন, যাতে বিবাহ-পরবর্তী জীবনে পিতামাতাকে প্রয়োজনে দেখাশুনা করতে পারেন। এইরকম অনেক সন্তানই বিবাহ-পরবর্তী জীবনে পিতামাতার বিষয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন। আবার এর বিপরীত চিত্রও দেখা যায়।

একমাত্র সন্তান কার্যোপলক্ষে বহুদূরে কোথাও চলে গেল, ক্রমশ তারা পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অনীহা প্রকাশ করতে আরম্ভ করল। তখন এইসব অসহায়, নিঃসঙ্গ বৃদ্ধা দম্পতিদের দুরবস্থা আরও বহুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অতি তৎপরতার সঙ্গে এই সুযোগ গ্রহণ করে অপরাধীরা। শারীরিকভাবে দুর্বল বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের আক্রমণ করে তাদের আহত বা নিহত করে যথাসর্বস্ব অপহরণ করে নিয়ে চলে যায়। শহরের অভিজাত আবাসন এলাকায় এইসব ঘটনা বেশিরভাগ ঘটে। কারণ, সেখানে মানুষের মধ্যে অন্তরের টান নেই, তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতিযোগী ভাবে। কিন্তু, দূরবর্তী গ্রাম বা পাড়া- সংস্কৃতি যেখানে প্রচলিত আছে সেখানে সচরাচর এমন ঘটনা ঘটে না।

এটা একটা নিদারুণ আর্থ-সামাজিক সমস্যাও বলা যায়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে কলকারখানা স্থাপন হচ্ছে না, উপরন্তু অনেক বড় বড় কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ফলে মানুষ বেরোজগার হয়ে পড়ছে। উপরন্তু যারা স্কুল-কলেজ থেকে পড়াশুনা করে বেরিয়ে আসছে তাদেরও কর্মসংস্থান হচ্ছে না। এর ফলে অপরাধ সংঘটনের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বর্তমানে অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এইসব বৃদ্ধবৃদ্ধাদের সাহায্য সহযোগিতায় এগিয়ে আসছে। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। এইসব সংকট-সমস্যা সমাধানে আমাদের আবার সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিই জীবনের অভিমুখ ঘোরাতে হবে।

মহাভারতে দেখা যায় যে ভীষ্ম যুদ্ধে আহত হয়ে যখন শরশয্যায় শায়িত হয়ে মৃত্যুর জন্য প্রহর গুনছেন, সেইসময় যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মের চরণতলে বসে নতমস্তকে তাঁর উপদেশাদি গ্রহণ করছেন। এর থেকে উপলব্ধি করা যেতে পারে তৎকালীন ভারতীয় সমাজে প্রবীণদের প্রতি কী প্রকার সম্মান জানানো হোত। ■

দুর্গাপুজা

নিছক পৌত্তলিকতা আর উৎসব! না বিজ্ঞান ও সত্যের তপস্যা

প্রীতীশ তালুকদার

দিন গোনা শুরু হয়ে গেছে, মা আসবেন; যত সময় এগিয়ে আসবে ততই আবেগ আর উত্তেজনার পারদ চড়তে থাকবে। প্রত্যন্ত গ্রাম হতে বড় বড় শহরের প্রতিটা হিন্দু বাড়ি, মন্দির, ক্লাব নতুন সাজে সেজে উঠবে জগন্মাতাকে বরণের আহ্লাদে। আকাশ, বাতাস, নদীর কিনারের কাশগুচ্ছ, শিউলি শাখারাও এই প্রকৃতিকে সাজিয়ে তুলবে আদ্যা-প্রকৃতিকে নিজেদের মাঝে পাবার আনন্দে। তারপর জগৎকে আনন্দ-প্লাবনে ভাসিয়ে মা আসবেন; কয়েকদিন পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণ, কাঁসর ঘণ্টা আর ঢাকের ছন্দ, আলোর রোশনাই, কচি-কাচাদের হুল্লোড়, বিভিন্ন বিনোদন অনুষ্ঠান, পথে পথে, মণ্ডপে মণ্ডপে মানুষের ভিড়ে দৈনন্দিন জীবনের নিত্য টানাপোড়েন ও দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলে আবেগ, ভক্তি, শ্রদ্ধা আর উৎসবের আনন্দে ভেসে যাওয়া। জগন্মাতা, আদ্যাশক্তি, মহামায়া, দুর্গতিনাশিনী দুর্গা প্রভৃতি কত নামে কত বিশেষণেই না ডাকে মানুষ তাদের আরাধ্যা দেবীকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই হিন্দুজাতি যেন আজও অভিশপ্তই থেকে গেল। মহাশক্তির আরাধনা করেও দুর্বলতা ঘুচল না। দুর্গতিনাশিনী'র ভক্তরা আজও যেন অনন্ত দুর্গতিতেই পতিত। কেন? সবই কি গল্প, কল্পনা, মিথ্যা, মনের বিলাসিতা, কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা? নিছকই আনন্দ-উৎসব? গল্প, কল্পনা, মিথ্যা, কুংসস্কার হোক বা না হোক বলতে খারাপ লাগলেও এ যে ক্রমে নিছকই মনের বিলাসিতা ও মন মাতানো আনন্দ-উৎসব হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা অনেকাংশেই বাস্তব সত্য; অবশ্য সেই সঙ্গে ভক্তি ও শ্রদ্ধার খোলসে মানসিক জড়তাও কম নয়। তাই ভক্তি, শ্রদ্ধা ও পবিত্রতার পূজাপ্রাঙ্গণে এসেছে উচ্ছৃঙ্খলতা, মত্ততা, নিষ্ঠাহীনতা। কিন্তু কেন এমন?

কারণ অনেক থাকতে পারে। ঈশ্বর ও তাঁর কর্মকে মানুষ প্রত্যক্ষ করতে পারে না,

এই আরাধনার ফল বুঝতে পারে না, ঈশ্বর ও ধর্মের গভীর তত্ত্বও সাধারণ মানুষ জানতে পারে না। অন্ধ-বিশ্বাস ও অন্ধ অনুকরণ থেকে আসে প্রত্যাশা ও হতাশা। বিজ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা পুষ্ট মন পুরাণ-কাহিনি, গল্প-গাথা ও পূজা-অর্চনায় যুক্তি খুঁজে পায় না, সাধু-সন্তদের বিশেষ বলে মনে হয় না। কারণগুলোকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, তবে সব কারণের মূল হয়তো মানুষ নিজেই জানে না তারা কী করছে, কেন করছে, কী পেতে এই আয়োজন, কীভাবে তা পাওয়া যায়। তাছাড়া এখন বিজ্ঞান ও যুক্তির যুগ, বিজ্ঞান যেমন একটার পর একটা জাগতিক রহস্য উন্মোচন করে চলেছে তেমন মানুষের জীবনে প্রত্যক্ষভাবে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতা এনে দিয়েছে। হয়তো সেই অজানার সুযোগ নিয়ে যুক্তিবাদী মনে ঈশ্বর, ধর্ম ও ধর্মাচার, মানসিক জড়তা আর আনন্দ-উৎসবের ধারণা রূপে গেড়ে বসেছে। প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই আছে অসুর ও দেবতা। দেবত্ব দ্বারা আসুরিক প্রবৃত্তি গুলোকে সংযত করতে পারলে এই পৃথিবী দুঃখ-কষ্ট- হীন সুখ ও শান্তির স্বর্গ হয়, আর মানব শরীরেই মানুষ ভগবান হয়ে যায়। অপর দিকে আসুরিক প্রবৃত্তি সাত্ত্বিক ভাবকে দমিত করে প্রবল হয়ে উঠলে হিংস্রতা, অন্যায়, অপরাধের উদ্দাম নৃত্যে মানুষের জীবন ও জগৎ দুঃখ-কষ্টে ভরে যায়। দেবত্বের অনুশীলনই ধর্ম, পূজা, তপস্যা, আরাধনা। এবার দেখা যাক দেবী দুর্গা ও তাঁর আরাধনা কীভাবে মানুষের কোন উপকারে লাগে।

স্তবমন্ত্রে দেবী দুর্গার রূপ বর্ণিত আছে। দেবী জটাজুট ধারিণী, ত্রিনয়না, সর্বাভরণ ভূষিতা, নবযৌবনসম্পন্না, দশ হস্তে দশ প্রহরণ ধারিণী। দেবীর ডান পা সোজাভাবে বাহন সিংহের উপর এবং বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অসুরের স্কন্ধে। নাগপাশ বেষ্টিত অসুর মহিষের কাটা স্কন্ধ দিয়ে অর্ধেক বেরিয়ে এসেছে, তার বুকে দেবী শূল বিদ্ধ করেছেন। দেবীর চারপাশে উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা, অতিচণ্ডিকা এই অষ্টশক্তি বিরাজিতা। কিন্তু বর্তমান পূজায় সে অষ্টশক্তির স্থান নিয়েছে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ যা প্রকৃতপক্ষে দেবীরই শ্রী, বিদ্যা, শক্তি ও সিদ্ধি এই চার গুণের প্রকাশ। দেবীর সামনে ডানদিকে নবপত্রিকাতে দেবীর প্রকৃতিরূপের পূজা হয়। দুর্গা-নাম শুনতেই দেবীর যে রূপ আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে, যে রূপে দেবীকে আমরা মন্দিরে মন্দিরে পূজা করে থাকি তা এই। ঋগ্বেদ তেত্রিশ কোটি দেবদেবী'র কথা বলে, যা প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি। এই

তেত্রিশ কোটি দেবতা মূলত এক ঈশ্বরেরই বিভিন্ন প্রকাশ তা-ও বলেছে। সেখানে দেবী দুর্গার কোনো উল্লেখ নেই। সেখানে দুই মুনিকন্যা 'বাক' ও 'রাত্রি' দেবীর আত্মদর্শনের সঙ্গে বর্তমান দেবী দুর্গা'র গুণের মিল আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুসারে মহিষাসুরের অত্যাচারের জর্জরিত দেবতাদের সম্মিলিত তেজপুঞ্জ হতে এক জ্যোতির্ময়ী মহাদেবীর আবির্ভাব ঘটে, এই দেবী-ই মহিষাসুরকে বধ করে জগৎকে ভয়মুক্ত করেন। দেবীভাগবত, বামনপুরাণ, কালিকাপুরাণ, তন্ত্রসার সেই একই কথা সমর্থন করে। তবে মহাভারত ও স্কন্দপুরাণ অনুসারে দেবসেনাপতি কার্তিক মহিষাসুরকে বধ করেন। আপাত বিসাদৃশ্য মনে হলেও তাত্ত্বিক ভাবে কোনো বিসাদৃশ্যতা নেই। দেবী দুর্গার উদ্ভব দেবতাদের সম্মিলিত শক্তিতে ও অসুর নাশের জন্য, কার্তিকের জন্মও অসুরনাশের উদ্দেশ্যে। সেই দেবীশক্তিরই সন্তানরূপে। কার্তিক দেবসেনাপতি অর্থাৎ দেবতাদের সম্মিলিত শক্তির পরিচালক। এই দেবীর নাম কোথাও চণ্ডী, কোথাও মহালক্ষ্মী, কোথাও কাত্যায়নী, আবার কোথাও জগদ্ধাত্রী, কোথাও মহাশক্তি তো কোথাও মহামায়া। দুর্গা নাম পাওয়া যায় না। মার্কণ্ডেয় পুরাণের এক স্থলে দানব শুম্ভ দেবীকে দুর্গি নামে অভিহিত করছে দেখা যায়। আর এক স্থলে দেবীচণ্ডী বলেছেন— ভবিষ্যতে দুর্গ নামক অসুরকে বধ করে আমি দুর্গা নামে অভিহিত হব। দেবীভাগবতের কাহিনিতে তিনি তা করেছেন। দুর্গতি নাশ করেন বলেই দেবী হয়তো দুর্গা নামেই বেশি প্রসিদ্ধা। ...কিন্তু বৈদিক দর্শন অনুসারে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের জল, অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকাশরূপই দেবদেবী; ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির ব্যাখ্যায় দেখা যায় বিশ্ব-প্রকৃতির সকল রূপে প্রকাশিত পরম ব্রহ্মের অমূর্ত হ্লাদিনী শক্তিই আদ্যাশক্তি মহামায়া দেবী দুর্গা, অথচ পুরাণের কাহিনি থেকে মনে হয় যেন মানুষের মতোই শরীরী দেবতারা কোনো দেবরাজ্যে মানুষের মতোই বসবাস করেন এবং তাঁদের দ্বারা এই বিশেষ ও বিচিত্র রূপের শরীরী দেবীর সৃষ্টি; এই বৈপরীত্ব কেন? এর বাস্তবতা ও তাৎপর্য কী?

'ভক্তানুরোধেন ঈশ্বরঃ রূপকল্পনা'— মানুষ তার মনোবাঞ্ছা অনুসারে ঈশ্বরের প্রতিমা গড়ে নেয়। বৈদিক দর্শন অতি গভীর তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ; তা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। শিক্ষিত হতে অশিক্ষিত, শিশু হতে বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ যাতে দর্শনের গভীর তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারে, দিকনির্দেশিকা পেতে পারে, তাদের মনে যাতে ভক্তি ও ধর্ম ভাবের বিকাশ হয় সে জন্যেই সহজ সরল ও আকর্ষণীয় রূপে পুরাণের অবতারণা। পুরাণে কিছু ইতিহাস থাকলেও দেবতা ও অসুরের কাহিনিগুলো রূপকের মাধ্যমে দর্শন ও ধর্মের শিক্ষা। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অজ্ঞানতা, হিংস্রতা, ঈর্ষা, মদমত্ততা প্রভৃতি রূপে অসুর সকল মানুষের মধ্যে বাস করে প্রতিনিয়ত তাড়িত করতে থাকে। যার ফলে মানুষের জীবনে দুঃখ, কষ্ট, অশান্তি, ধ্বংস নেমে আসে। মানুষের নিজের অভ্যন্তরের সেই অসুরকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিনটি সমান ফলার ত্রিশূল যেটার একটাই শূলাতীত বা গুণাতীত মূল দণ্ড এবং যেটা ধরা থাকবে সেই মানুষেরই বিবেক নামক চৈতন্য সত্তা বা দেবসত্তার হাতে, তা দ্বারা বিদ্ধ বা দমন করতে হবে। আর মানুষের অভ্যন্তরে যেহেতু অসুর আছে এবং মানুষ নিয়েই বৃহত্তর সমাজ, তাই এই সমাজেও অসুরের বাস। 'দশ' শব্দ বহুর প্রতীক; দেবীর এক দেহে দশ হাত এবং সকল দেবতাদের সম্মিলিত তেজ হতে উদ্ভবের কাহিনি শুভ চেতনাসম্পন্ন মানুষকে সৎ উদ্দেশ্যে এক মন, এক প্রাণ, শক্তি ও লক্ষ্যে একত্রিত হয়ে অশুভের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইঙ্গিত দেয়। দেবীর পূজায় সমাজের বিবিধ ক্ষেত্র হতে বিবিধ আয়োজনের আবশ্যকতা এক লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ সমাজের জন্যই। পশুরাজ সিংহ দেবীর বাহন। বাহন বলতে আমরা সাধারণত বুঝি যা আমাদের শরীরটাকে এক স্থান হতে আর এক স্থানে বহন করে নিয়ে যায়। এই বহনযন্ত্র অবশ্যই বাহন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সারা জীবন প্রতিনিয়ত আমাদের বহন করছে আমাদের বুদ্ধি, সিদ্ধান্ত, শক্তি, উদ্যম, কুশলতা, তৎপরতা, হিংস্রতা, নির্মমতা, ক্ষিপ্ততা, নৃশংসতা প্রভৃতি পাশবিক গুণ গুলো তারই ইঙ্গিতবহ পশুরাজ সিংহ। তবে যেমন পশুরাজ সিংহের উপর দেবীর অবস্থান, তেমনি নিজের এই পাশবিক গুণগুলোর উপর দেবত্বের প্রতিষ্ঠা ও নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। তবে এর জন্য চাই ভক্তি ও পূজা। আচার্য শঙ্কর বলেছেন, 'স্ব-স্বরূপানুসন্ধানং ভক্তি-রিত্যাভিধীয়তে', অর্থাৎ 'নিজ স্বরূপের অনুসন্ধান আকাঙ্ক্ষাই ভক্তি।' কে আমি? আমি সেই সত্য, সনাতন, আনন্দময় পরমব্রহ্ম। এই সত্যকে জানা, বিশ্বাস করা ও নিজে অনুভব করতে পারলে তবেই সদ্‌গুণের সমাদর সম্ভব। সাধারণ প্রচলিত অর্থে পূর্ণ বিশ্বাস ও সমর্পণের ভাবই ভক্তি। ভক্তি দিয়ে কার পূজা করব? না জেনে না বুঝে প্রচলিত প্রথা ধরে নিয়ে কিছু করাটা বিশ্বাস বা ভক্তি কোনোটাই নয়, তা অন্ধবিশ্বাস ও মানসিক জড়তা। যার পূজা করব তার তত্ত্ব, ইঙ্গিত, তাৎপর্য জানা ও তাতে মন-প্রাণ দ্বারা সমর্পিত থাকাই বিশ্বাস; আর বাস্তবে পূর্ণ আস্থায় ব্যবহার ও কর্মে তার প্রকাশই সমর্পণ।

আর ফুল, ফল ইত্যাদি বাহ্য উপাচার দ্বারা যে পূজা তা সত্যের লক্ষ্যে বাহ্য ক্রিয়ার অনুশীলন মাত্র, যা বই-খাতা বগলে করে বিদ্যালয়ে যাবার মতো। পুস্তক ও শিক্ষকের পূজা হয় বিদ্যা অর্জন করে ও চরিত্রবান হয়ে; পিতা-মাতার পূজা তাঁদের সেবা করে ও তাঁদের নির্দেশিত পথে চলে; কর্মক্ষেত্রের পূজা হয় নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে; তেমনি ভাবে মহাশক্তি মহাদেবীর পূজা হয় মানুষের নিজের ভিতরে, বাইরে, সমাজে সর্বত্র শুভশক্তির জাগরণ ঘটিয়ে অশুভ শক্তির বিনাশে। আমাদের প্রত্যেকের ভিতরেই মহিষাসুর আছে, আদ্যাশক্তি মহামায়া দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গাও আছেন। নিজের অভ্যন্তরের সেই দেবীকে জাগিয়ে নিজের ভিতরের ও বাহিরের মহিষাসুরকে দমনই জগন্মাতার আরাধনা। ■

শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়িনী রুক্মিণী

সুতপা বসাক ভড়

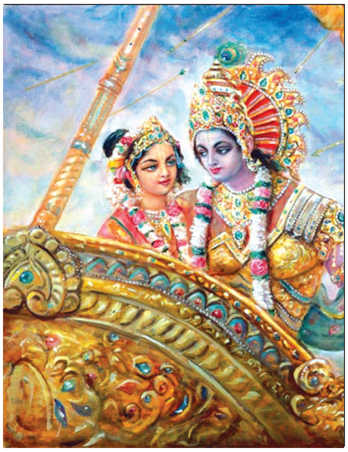

বিদর্ভের রাজা ভীষ্মক। তাঁর পাঁচ পুত্র এবং একমাত্র কন্যা আদরিণী রুক্মিণী। অপূর্ব রূপসী, গুণবতী এবং চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য তাঁর খ্যাতি দিকে দিকে ছাড়িয়ে পড়েছিল। অপরদিকে শ্রীকৃষ্ণের লীলা চলছে দ্বারকায়। সমগ্র ভারতবাসী আগ্রহের সঙ্গে সেই লীলা উপভোগ করছেন—রুক্মিণীও তার ব্যতিক্রম নন। স্বয়ং বৈকুণ্ঠের মা লক্ষ্মীর অংশাবতার রুক্মিণী দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রবল প্রেমে আকর্ষিত হন এবং দিনে দিনে বাসুদেবের প্রতি তাঁর এই আকর্ষণ প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে। আত্মীয়-পরিজন প্রায় সকলেই তাঁর এই একাত্ম প্রেমকে মেনে নিলেন এবং স্বীকৃতি দিলেন। মানতে পারলেন না কেবল বিদর্ভরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ রুক্মা। তাঁর একান্ত ইচ্ছা চেদীরাজ শিশুপালের সঙ্গে আদরের বোন রুক্মিণীর বিবাহ হোক। বৃদ্ধ বিদর্ভরাজ যুবরাজের মতামতকে অস্বীকার করতে পারলেন না। যথাসময়ে শিশুপালের সাথে রুক্মিণীর বিবাহের আয়োজন শুরু হলো।

রুক্মিণী দেখলেন জ্যেষ্ঠভ্রাতার মতের বিরুদ্ধে যাবার সাহস রাজ্যে কারোর নেই। বৃদ্ধ পিতা রাজা ভীষ্মক রুক্মার জিদের কাছে অসহায়। তিনি তখন নারীসুলভ লাজ-লজ্জা পরিত্যাগ করে অসীম সাহসে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে পরামর্শ করলেন এবং নিজহস্তে একখানি পত্র লিখে নিজেকে নিবেদন করলেন শ্রীকৃষ্ণচরণে। পত্রখানি ব্রাহ্মণের হাতে পাঠালেন দ্বারকাধিপতির কাছে। ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ দ্বারকার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলেন এবং যথাসময়ে সেটি শ্রীকৃষ্ণের হস্তগত হলো।

পত্রে রুক্মিণী লিখেছেন যে তিনি কৃষ্ণকে নিজের হৃদয় দিয়েছেন এবং স্বামী হিসেবে মনে মনে বরণ করেছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে আকুল আবেদন করেছেন যেন তিনি যতশীঘ্র সম্ভব রুক্মিণীকে উদ্ধার করেন এবং বিবাহ করেন। তিনি আরও জানিয়েছেন যে দেরি হলে চেদীরাজ শিশুপালের সঙ্গে রুক্মা তাঁর বিবাহ দেবেন। সেক্ষেত্রে আত্মহত্যা ভিন্ন রুক্মিণীর সামনে কোনো উপায় থাকবে না। পরবর্তী জন্মে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই মিলিত হবেন। তিনি পত্রে এও জানিয়েছেন যে দ্বারকাধিপতি যেন সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে আসেন, কারণ শিশুপাল এবং জরাসন্ধের বিশাল সৈন্যবাহিনী শ্রীকৃষ্ণকে বাধা দেবার প্রাণপণ চেষ্টা করবে।

পত্রপাঠ শ্রীকৃষ্ণ রওনা হলেন রুক্মিণী উদ্ধারের জন্য। এদিকে বলরাম ভাইয়ের অকস্মাৎ কুণ্ডিলাপুরের (বিদর্ভের রাজধানী) উদ্দেশে রওনা হওয়ার খবর পেয়ে বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে অনুসরণ করলেন শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যার্থে।

পরদিন প্রত্যুষে অনুচরীসহ সুরক্ষা বেষ্টনীর মধ্য দিয়ে বিদর্ভ রাজকন্যা রুক্মিণী পৌঁছলেন মাতা পার্বতীর মন্দিরে। রুক্মিণী নিজ হৃদয়ের আকুল প্রার্থনা নিবেদন করলেন দেবীর চরণে— 'দেবী ভগবতী আমার প্রার্থনা পূর্ণ করো। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনই হলো আমার জীবনের একমাত্র ধ্যেয়'। মন্দিরে দেবী পার্বতীকে নতমস্তক প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে বাইরে এসে দেখলেন শ্রীকৃষ্ণ রথ-সহ প্রতীক্ষারত। আর দেরি নয়, দৌড়ে রথে উঠলেন তিনি। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ রওনা হলেন দ্বারকা অভিমুখে।

ঘটনার আকস্মিকতায় উপস্থিত সকলে হতপ্রভ। সম্বিত ফিরে পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সেনাপ্রধান যুবরাজ রুক্মাকে খবর পাঠালেন। ক্রুদ্ধ রুক্মা প্রতিজ্ঞা করলেন— শ্রীকৃষ্ণকে পরাস্ত না করে তিনি রাজধানী কুণ্ডিলাপুর ফিরবেন না। এদিকে শিশুপালের সঙ্গে রাজকন্যা রুক্মিণীর বিবাহোপলক্ষ্যে বিদর্ভের রাজধানী কুণ্ডিলাপুর ভব্য সাজে সুসজ্জিত হয়েছে এবং শ্রীকৃষ্ণের যত শত্রু নৃপতি ছিলেন, তাঁরা সবাই একত্রিত হয়েছেন। যুবরাজ রুক্মা সম্মিলিত লোক-লস্কর, সৈন্য-সামন্ত নিয়ে চললেন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। ততক্ষণে বলরাম পৌঁছে গেছেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে। শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের সঙ্গে যুবরাজ রুক্মার ভীষণ যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে রুক্মা পরাজিত হলেন। দুঃখিত, লজ্জিত রুক্মা কুণ্ডিলাপুর ফিরলেন না। ভোজকাটা নামক স্থানে নতুন রাজধানী স্থাপন করে সেখান থেকেই রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করতে লাগলেন।

অপরদিকে, দ্বারকাতে তখন বিবাহোৎসব চলছে শ্রীকৃষ্ণ- রুক্মিণীকে কেন্দ্র করে। রুক্মিণী অভিভূত, আপ্লুত জগতের স্বামী শ্রীকৃষ্ণকে নিজ পতিরূপে পেয়ে। জীবনের অতি প্রারম্ভে যে কৃষ্ণপ্রেমের বীজ তাঁর হৃদয়ে প্রোথিত করেছিলেন, তার পালন পোষণেই তিনি বাকি জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পূজারিণী রুক্মিণীর স্থান মহাভারতে স্বর্ণাক্ষরে রচিত হয়ে আছে।

নবাঙ্কুর

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু

ভারতে বিজ্ঞানচর্চার একজন অন্যতম পথিকৃৎ হলেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ভারতের বিজ্ঞানচর্চাকে তিনি এক অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছেন। বৈদিক যুগে ভারতে বিজ্ঞানচর্চা হোত। আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য, চরক, সুশ্রুত প্রমুখ সে যুগের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী। কিন্তু তারপর প্রায় হাজার বছর ভারতে বিজ্ঞানচর্চা হয়নি। যেটা ভারতের অন্ধকারময় যুগ। এর অবসান ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এই শতাব্দীতে ভারতে আবার বিজ্ঞানচর্চা আরম্ভ হয়। যে সমস্ত বিজ্ঞানীর হাত ধরে এটা শুরু হয় তাদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বসু অন্যতম।

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্ম ১৮৯৪ সালের ১ জানুয়ারি। কলকাতার গোয়াবাগানে। বাবা সুরেন্দ্রনাথ বসু ও মা আমোদিনী দেবীর প্রথম সন্তান। রবীন্দ্রনাথ ছোটবেলায় যে স্কুলে পড়তেন সত্যেন্দ্রনাথও সেই নর্মাল স্কুলে ভর্তি হন । তখন তাঁর বয়স পাঁচ বছর। স্কুল শেষ করে ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। সত্যেন্দ্রনাথ যেমন মেধাবী ছিলেন তেমন তাঁর দুষ্টবুদ্ধিরও অভাব ছিল না। মজা করে স্যারকে তিনি নানা বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন করতেন। স্যার একদিন কার্য কাকে বলে তা পড়াচ্ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ উঠে প্রশ্ন করলেন— স্যার, ধরুন একজন লোক একটি বিশাল পাথর ঠেলতে ঠেলতে ঘেমে গেল। কিন্তু তা নড়াতে পারল না। তাহলে কি সে কোনো কাজ করল না? শুনে ক্লাসের সবাই মুখ টিপে হাসতে লাগল। এই সত্যেন্দ্রনাথই পরবর্তীতে একজন পদার্থ বিজ্ঞানী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

তিনি প্রথমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। পরে যোগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। মন দেন গবেষণায়। ১৯২৪ সালে আইনস্টাইনকে তিনি একটি গবেষণাপত্র পাঠান। যেটা 'বোস সংখ্যায়ন' নামে পরিচিত। এই গবেষণা তাঁকে বিশ্বজোড়া খ্যাতি এনে দেয়। তারপর গবেষণার কাজে ইউরোপের বহু জায়গায় যান। সাক্ষাৎ করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সঙ্গে। প্রকাশ করতে থাকেন বিভিন্ন গবেষণাপত্র। শুধু বিজ্ঞান গবেষণাই নয়, মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রসার করতেও তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে নিজে বাংলাভাষায় পড়াতেন। তিনি মনে করতেন মাতৃভাষায় বিজ্ঞান পড়ালে তা ছাত্রদের কাছে বেশি আকর্ষণীয় ও মনোজ্ঞ হবে। 'বিজ্ঞান পরিচয়' নামে একটি বিজ্ঞান পত্রিকাও প্রকাশ করেন তিনি।

সত্যেন্দ্রনাথ অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজে যেমন সময় দিতেন তেমনি সাহিত্য ও সঙ্গীতচর্চাতেও বেশ পারদর্শী ছিলেন। খুব সুন্দর এসরাজ বাজাতেন। ঢাকায় তাঁর বাড়িতে মাঝে মাঝেই বসত গানের আসর। এখানে গুরু শিষ্যের একটা মিল পাওয়া যায়। আইনস্টাইনও ভালো বেহালাবাদক ছিলেন। বাইরে থেকে কোনো সঙ্গীতজ্ঞ ঢাকায় এলে তাঁর বাড়িতেই আতিথ্য গ্রহণ করতেন। এরকম বহু গুণ ছিল সত্যেন্দ্রনাথ বসুর। এত বড়ো মাপের একজন মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিন্তু খুব সাধারণ জীবনযাপন করতেন। পোশাক-পরিচ্ছদে কোনো আড়ম্বর ছিল না। বাড়িতে পরতেন লুঙ্গি, বাইরে গেলে পাজামা। কোনো অনুষ্ঠানে যেতেন বাঙালি পোশাকে। অর্থ, যশ কোনোকিছুর প্রতি তিনি লালায়িত ছিলেন না। জীবনে যতটুকু পেয়েছেন তাতেই সন্তুষ্ট থেকেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন বিজ্ঞান জগতে এক উজ্জ্বলতম জোতিষ্ক।

বিরাজ নারায়ণ রায়

মনীষী কথা

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

তীব্বতে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলেছিলেন অতীশ দীপঙ্কর। দুর্গম পর্বত পেরিয়ে বাংলা থেকে তিব্বতে যান এই বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। সমৃদ্ধ করেন সেখানকার ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে। অতীশ দীপঙ্করের জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। তাঁর জন্ম ৯৮০-৯৮২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। সর্বশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করে ধর্মরক্ষিত নামে এক বৌদ্ধ আচার্যের কাছে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন। তারপর উনত্রিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, পরিচিত হন অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নামে। ধর্মশাস্ত্রে আরও গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি সুবর্ণদ্বীপে যান। গৌতমবুদ্ধ ভারতের সব রাজাদের ধর্মের সূত্রে ঐক্যবদ্ধ করে পৃথিবীতে শান্তি আনতে চেয়েছিলেন। সুবর্ণদ্বীপ থেকে ফিরে এসে অতীশ দীপঙ্কর এই কাজে ব্রতী হন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি তিব্বত যাত্রা করেন। সেখানে গিয়ে ধর্মের মাধ্যমে স্থাপনা করেন এক উন্নত সংস্কৃতির। রচনা করেন বহু গ্রন্থ, তার মধ্যে একটি হলো— বোধিপথ প্রদীপ। তাই শুধু তিব্বত নয় সারা পৃথিবী আজও তাকে দেবতা বলে পূজা করে।

প্রশ্নবাণ

১. বিশ্বের প্রাচীনতম ভাষা কী?

২. বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ কোন্ ভাষায় রচিত?

৩. আদি শব্দ কোন্‌টিকে বলা হয়?

৪. সংস্কৃতের পর পৃথিবীতে কোন্ ভাষা বিকাশলাভ করে?

৫. ভারতে সংবিধান স্বীকৃত ভাষা কয়টি?

উত্তর : ১. সংস্কৃত। ২. পালি।
৩. ওঁ। ৪. ইংরেজি। ৫. ২২টি।

ছবিতে অমিল খোঁজ

ছোটদের কলমে

মা সরস্বতী

সৌম্যজিত খাঁ, দ্বিতীয় শ্রেণী

বিদ্যাবুদ্ধি নাইকো আমার
ও মা সরস্বতী,
বর দাও মাগো যেন
থাকে বিদ্যায় মতি।
পড়াশোনার জন্য মাগো
বকুনি সবার খাই,
আমিও তো সবার মতো
মানুষ হতে চাই।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : ৮৪২০২৪০৫৮৪
E-mail : swastika5915@gmail.com

মেল করা যেতে পারে।

অঙ্গনা

পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান মেয়েদের চিন্তাভাবনা

অনসূয়া চন্দ্র

কয়েকদিন আগে এক প্রাক্তন ছাত্রীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। মাত্র এক বছর আগে মেয়েটি বি.এ পাশ করেছে। তা সত্ত্বেও প্রথমটা চিনতে পারিনি। মেয়েটি যখন কলেজে আসত তখন তার পরনে থাকত সালোয়ার কামিজ। কিন্তু এখন তার আপাদমস্তক বোরখায় আবৃত। শুধু চোখ দুটো আর কব্জি থেকে হাতের আঙুল— এই মাত্র দেখা যাচ্ছে। ওই কলেজ পশ্চিমবঙ্গের কোনো প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত নয়। কলকাতা শহরের কাছাকাছিই তার অবস্থান। ছাত্রছাত্রীরা যথেষ্ট আধুনিক অন্তত বাহ্যিক আচার-আচরণে। বহু ছাত্রী কলেজে জিনস-টপ পরে আসে। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে মুসলমান ছাত্রীদের পোশাক- পরিচ্ছদে একটা বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম।

আগে মুসলমান ছাত্রী ও হিন্দু ছাত্রীদের মধ্যে বাহ্যত খুব একটা পার্থক্য চোখে পড়ত না। ক্লাসে কোনো মুসলমান ছাত্রীকে হিজাব পরতে দেখিনি। কিন্তু ইদানীং অধিকাংশ ছাত্রীকেই দেখছি হিজাব পরতে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের একটা বড় অংশের মধ্যেও এই প্রবণতা লক্ষ্য করেছি। অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার অনুমোদিত কলেজগুলিতে ধর্মনিরপেক্ষ আবহ এবং শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু মুসলমান ছাত্রীদের বৃহত্তর অংশটা সেখানে নিজেদের ধর্মীয় ‘আইডেন্টিটি’ জাহির করার জন্য বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে। ব্যতিক্রম যে কিছু নেই তা নয়। তবে তাদের ওই ব্যতিক্রমী সত্তাটা ক’দিন বজায় থাকবে তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কলেজে এক মুসলমান ছাত্রীর জিনস-টপ পরা নিয়ে তার স্বধর্মাবলম্বী বন্ধুরা ব্যঙ্গোক্তি করতে ছাড়ত না। কারণ, ওটা নাকি ইসলামি সংস্কৃতির সঙ্গে মানানসই নয়। হয়তো ক্রমাগত টীকা-টিপ্পনীর জ্বালায় এই মেয়েটিও একদিন আপাদমস্তক বোরখা পরিবৃত হয়ে কলেজে আসা শুরু করবে! তথাকথিত ‘সেকুলার’ বন্ধুরা হয়তো আমাকে বলবেন আমি কারোর ব্যক্তিগত বিশ্বাসে আঘাত করছি। তা নয়। ভারতীয় সংবিধানের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা আমার আছে এবং কাউকে আমি ব্যক্তিগত আঘাতও করছি না। কিন্তু একটা ছোট্ট কৌতূহল। হিন্দু ছাত্রীরা যদি কপালে কুমকুম-চন্দনের তিলক বা দইয়ের ফোঁটা দিয়ে কলেজে আসে তখন এদেরই একটা অংশ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে তাদের বিদ্রূপ করে কেন?

মুসলমান ছাত্রীদের একটা অংশের কাছে শুনলাম তাদের পরিবারে নাকি ইসলাম ধর্ম এবং সংস্কৃতি বিষয়ে পড়াবার জন্য পৃথক গৃহশিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। এইসব ছাত্রীদের যদি নাম জিজ্ঞাসা করেন এরা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় আমার নাম অমুক। আমি মুসলমান। অর্থাৎ ধর্মীয় ‘আইডেন্টিটি’টা জুড়ে দেবেই। নামের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হলে দশ জনের মধ্যে অন্তত আট জনের তা জানা নেই। যে নামের অর্থ জানে না নামকরণের সময় সেটাই রাখবে কিন্তু তা সত্ত্বেও বাঙালি নাম রাখা চলবে না। পাছে সেটা হিন্দুঘেঁষা হয়ে যায়। এক ছাত্রীর নাম একটি বিখ্যাত সাহিত্যকীর্তির নামে রেখেছিলেন তার অভিভাবকরা। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য মুসলমান ছাত্রীদের প্রশ্ন— ‘এই তোর নামটা এরকম হিন্দুমার্কা কেন রে?’ একজন মুসলমান একটি ওয়েবসাইটে লিখেছেন— ‘বৃষ্টি, মেঘনা, আকাশ— এই ধরনের নামগুলো আমার পছন্দ। কিন্তু তাই বলে এইসব হিন্দুঘেঁষা নামকরণ আমার সন্তানদের ক্ষেত্রে চলবে না।’ কেন? আপত্তি অথবা ভয়টা কীসের? মোল্লা-মৌলবি শাসিত তাদের সমাজ মেনে নেবে না বলে।

বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশ তো মুসলমানদের কোনো আইনি দণ্ড দেওয়া হলেই রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলে চিৎকার করেন। মুসলমানদের ৯৯.৯ শতাংশের ধারণা শুধু মুসলমান বলেই তাদের শাস্তি পেতে হচ্ছে। এর বীজ বপন হয়ে যায় কিন্তু শৈশব বা কৈশোরেই। নিজের ছাত্রীজীবনেও দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো একটি ছাত্রীকে একটা অপরাধ করে শাস্তি পেতে হয়েছিল বলে সে প্রচণ্ড ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিল— ‘আমি মুসলমান বলেই বাকি ছাত্রীরা আমাকে ফাঁসিয়েছে।’ উল্লেখ্য, আমাদের সেই আরো অনেকগুলি মুসলমান ছাত্রী ছিল। পূর্বোক্ত ছাত্রীটির অভিযোগ যদি সত্য হয় তাহলে ক্লাসের অন্যান্য ছাত্রীরও ‘ফেঁসে’ যাওয়ার কথা! তা কিন্তু হয়নি। অথচ কী কৌশলে ছাত্রীটি পুরো ঘটনায় একটা ধর্মের রং লাগিয়ে দিল! আবার শিক্ষকতা করতে গিয়েও দেখেছি কোনো একটি ছাত্রীর কিছু অন্যায় আচরণের জন্য তার সঙ্গে অন্য ছাত্রীদের বাক্যালাপ বন্ধ আছে। ঐ ছাত্রীটি নিজের দোষ তো গুরুত্ব দিয়ে দেখলোই না উপরন্তু অভিযোগ করতে লাগল, ‘জানেন দিদি, আমি মুসলমান বলে ওরা আমাকে অন্য দিদিমণিদের দিয়ে বকুনি খাইয়েছে।’ অর্থাৎ সে মিথ্যা বলুক, অন্যদের সঙ্গে অহেতুক ঝগড়া করুক কিংবা পরীক্ষার হলে অসুদপায় অবলম্বন করুক— ‘মুসলমান’ হওয়ায় তাকে কোনো শাস্তি দেওয়া যাবে না।

মুসলমান মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে লক্ষ্য করেছি যে, এরা শুধু সলমন- আমির-শাহরুখ-সইফ খানের ছবি দেখে। আরো মজার কথা, অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফকে মুসলমান ধারণা করে এদের মধ্যে তাঁর অনেক অনুরাগিনী ছিল। কিন্তু যেইমাত্র জানা গেল যে ক্যাটরিনা মুসলমান নন তখন সেই অনুরাগ অন্তর্হিত হলো! এরা জাহির খান এবং মহম্মদ শামির ভক্ত, তবে ক্রিকেটীয় প্রতিভার জন্য নয় বরং মুসলমান হওয়ার জন্য। পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের প্রতি এদের অনেকের তীব্র অনুরাগ!

যত দিন যাবে এই প্রবণতা আরো বৃদ্ধি পাবে। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ নেতা এবং বুদ্ধিজীবীরা এর জন্য দায়ী থাকবেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই যদি হিজাব পরে ইফতার পার্টিতে যান তাহলে এদের কে দোষ দেবে? মুসলমানদের মধ্যে এখনো যে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা রয়েছেন একমাত্র তাঁরাই এদের আলোর দিশা দেখাতে পারেন। ■

সৈনিকের সম্মান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে

অতিথি কলম

তরুণ বিজয়

সৈনিক কি কেবল যুদ্ধে শহীদ হয়ে বা সীমাবর্তী অঞ্চলে অসম্ভব পরিস্থিতিতে বিজয় পতাকা উত্তোলন করার জন্যই সম্মান পাবে? তাঁরা সৈনিক-পোশাক ধারণ করার সময় থেকে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত বীর ভারতীয় নাগরিক হিসাবে বিবেচিত হন। কিন্তু সমাজে সৈনিকের প্রতি সম্মান ধীরে ধীরে কম হতে দেখা যাচ্ছে। একটা সময় ছিল যখন সেনাবাহিনীতে যোগদান গর্বের তথা সম্মানের বিষয় ছিল। সৈনিকের প্রতি সমাজ ও সরকারের উচ্চ ভাবনা থাকতো, সেনাবাহিনীর কঠিন পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দেওয়া যায় তারও বিশেষ প্রয়াস করত প্রশাসন। বর্তমানে তার বদলে বিড়ম্বনাজনক তিরস্কার বা উপেক্ষা করতে দেখা যাচ্ছে। পরপর ছ'জন প্রধানমন্ত্রী সেনাবাহিনীর কর্তাদের কথা দিয়েছিলেন যে 'এক পদ এক পেনশন' প্রথা চালু করে আর্থিক সমতা আনবেন, কিন্তু তার বদলে সেনাবাহিনীর কর্তাদের কেবল 'যন্তর মন্তর'-এ ধরনা দেওয়াই নয়, গত ১৪ আগস্ট পুলিশের অভদ্র ও হঠকারী পদক্ষেপের কারণে তাঁদের ক্ষত গভীরতর হতে দেখা গেল।

'ওয়ান র‍্যাঙ্ক ওয়ান পেনশন' ঘোষণায় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞ প্রাক্তন সৈনিকরা।

আমি প্রায়ই রেল ভ্রমণের সময় দেখি যে ট্রেনে সাধারণ জওয়ান অসংরক্ষিত কামরায় মালপত্র নিয়ে বাথরুমের পাশে বসে থাকেন। আমরা দূরদর্শনে যখন দেখি রেলগাড়িতে ভ্রমণরত সৈনিক কোনো বিপদ থেকে সাধারণ যাত্রীকে রক্ষা করে তখন সবাই সৈনিকের প্রশংসা করেন, কিন্তু বাথরুমের পাশে বসা সৈনিককে নিজেদের সংরক্ষিত আসনে বসতে দেওয়ার কথা ভাবি না। কোনো টি টি বা রেলকর্মচারী সৈনিক-যাত্রীকে বিশেষ সাহায্য করছেন— এরকম দেখা যায় না, বরং তারা পুলিশকে ভয়ের চোখে দেখে এবং পুলিশ একজন জওয়ানের তুলনায় বেশি সুবিধা ভোগ করে। সরকারি অফিসার বা নেতাগণ তখনই সৈনিকের প্রতি কিছুটা সম্মান দেখান যদি তা প্রচারমাধ্যমে স্থান পায়। সাধারণত কোনো শহীদ সৈনিকের অন্তিম সংস্কারের সময় বড় নেতা বা মুখ্যমন্ত্রী নিজেরা না গিয়ে সচিবদের পাঠিয়ে দিয়ে সমবেদনা ব্যক্ত করেন।

কারগিল দিবসে 'ইন্ডিয়া গেটে' শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার পর যখন সৈনিকগণ 'যন্তর মন্তর'-এ ধরনায় বসেছিলেন তখন আমি তাঁদের নিকট গিয়েছিলাম। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আমাকে চিনতেন এবং সৈনিকদের প্রতি আমার মনোভাব কেমন তাও জানতেন। আমাকে তাঁদের মধ্যে বসালেন ও ঘোষণা করলেন যে আমি তাঁদের সঙ্গে একমত। ওখানে ৮৫ ও ৯০ বছর বয়স্ক সৈনিকও এসেছিলেন। আমি তাঁদের বললাম যে সরকার 'একপদ এক পেনশন' দিতে বদ্ধপরিকর এবং এই কষ্টসাধ্য ধরনা দেওয়ার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তাঁরা শুনলেন না। ধরনা দৃশ্য দেখে মনে কত দুঃখ হয় তা ভাষায় বর্ণনা করা খুব মুশকিল। দুনিয়ার কোনো দেশে এরকম দৃশ্য দেখা যায় না। সৈনিকের অর্থই হলো গর্বিত, পরিশ্রমী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বীর।

পাঞ্জাবে প্রতি বাড়ি থেকে কেউ না কেউ সেনাবাহিনীতে যায় এবং সেইজন্য ওখানে ভাইকে বীরজী বলে ডাকা হয়। উত্তরাখণ্ডে তো সৈনিককে দেবতার চেয়েও বেশি সম্মান দেওয়া হয়। এরকম প্রায় সব প্রদেশে দেখা যায়। এই সমস্ত বীর সৈনিক নিজের প্রাপ্ত মেডেল লাগিয়ে 'যন্তর মন্তরে' ধরনায় বসেছেন। এরচেয়ে বড় বিড়ম্বনা আর কী হতে পারে! অতীতে আমি জম্মু-কাশ্মীরে সৈনিকদের জন্য বিশেষ জমি ও ফ্ল্যাট দিয়ে বসবাস করানো এবং জম্মু-কাশ্মীরের আর্থিক বিকাশের জন্য তাঁদের সহযোগিতা নেওয়ার কথা বলেছিলাম। দেশদ্রোহী ছাড়া সব পক্ষ থেকে এই বক্তব্যের সমর্থন এসেছিল। গিলানির মতো লোক এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনের হুমকি দিয়েছিল এবং দুঃখের বিষয় বিভিন্ন দেশভক্ত লোকেরা দেশদ্রোহিতার কড়া জবাব না দিয়ে মিনমিন সুরে সাফাই গেয়েছেন। সৈনিকের প্রতি আমাদের সম্মান দুধের মতো ভেজাল যার মধ্যে কোনো সার নেই। প্রাণ দেওয়ার সময় ও সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে শত্রুকে খতম করার সময় সৈনিকের প্রয়োজন হয় কিন্তু ওই সৈনিকের প্রতি সম্মান বা মর্যাদা দেখানোর সময় সবাই নিজেদের রাজনৈতিক লাভ ও সেকুলার পরিধির মধ্যে থাকার চেষ্টা করেন।

আজ পর্যন্ত কেউ চিন্তা করেননি যে ৫৪২ জন সাংসদদের কোনো ছেলে সেনাবিভাগে যায়নি কেন? কেন আইএএস, আইপিএস অফিসারদের মুসৌরীস্থিত লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রশাসনিক অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণের পর একবছর সেনাবিভাগে যোগদান বাধ্যতামূলক হচ্ছে না। কেন প্রত্যেক সাংসদের শপথ গ্রহণের পর তিনমাস সেনা অনুভব, সীমান্ত জীবন দর্শন করার জন্য বাধ্য করা হচ্ছে না? যে সমস্ত লোকের সৈনিক জীবনানুভব কেবল টেলিভিশন পর্দার মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাঁদের কাছ থেকে সৈনিকদের প্রতি সঠিক সিদ্ধান্ত ও আবশ্যক তীব্র সমবেদনা শোনার আশা কীভাবে করা যায়? সৈনিক কেবল ২৬ জানুয়ারি, ১৫ আগস্টে গাওয়া গানগুলির সাজানো শব্দ নয়, বরং তাঁরা দেশের জীবন্ত দেবতা। ইজরায়েলের প্রত্যেক নাগরিকের এক বছর সৈনিক হিসাবে কাজ করা বাধ্যতামূলক। আমেরিকাতে প্রায় সব রাষ্ট্রপতি কিছু বর্ষ সৈনিক জীবন কাটিয়ে রাজনীতিতে এসেছেন এবং ইরাক ও আফগানিস্তান যুদ্ধের সময় বড় বড় নেতা, সাংসদ, শিল্পপতি, অধ্যাপক একবছর করে স্বেচ্ছায় সেনাবিভাগে কাজ করেছেন। আমেরিকা সেনেটের একমাত্র হিন্দু সাংসদ তুলসী গাবার্ড সংসদীয় নির্বাচনের একবছর পূর্বে আফগানিস্তানে আমেরিকার সেনা বিভাগে অস্থায়ীভাবে ভর্তি হয়ে কঠিন জীবন অতিবাহিত করেছেন। আমাদের দেশে তো নেতা ও অফিসারদের লোক দেখানো সীমান্ত দর্শনেরও সুযোগ কম আসে।

ছদ্ম সেকুলার ও বামপন্থী শিক্ষা সংস্থার জন্য আমাদের পাঠ্যপুস্তক বা পাঠ্যক্রমে সৈনিকের প্রতি সম্মান দেখানোর মতো কোনো বিষয় অন্তর্ভুক্ত নেই। ক'টি পাঠ্যপুস্তকে পরমবীর চক্র প্রাপকদের কথা, কারগিল যুদ্ধ বা ১৯৭১ যুদ্ধের রোমাঞ্চকর কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে? যদি কোনো শহরের ছেলে-মেয়ে সৈন্যক্ষেত্রে শহীদ হয় এবং তার পার্থিব শরীর শহরে আনা হয় তবে ক'টি বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয় বা বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা ছাত্রদেরকে তাঁর সম্বন্ধে উৎসাহজনক ঘটনা শোনান? কিন্তু দুরাচারী বা পাপাচারী অফিসার বা নেতার মৃত্যু হলে সরকারি অফিসে ছুটি ঘোষণা করা হয়। সৈনিকের ধন চাই না, সম্মান চাই। সৈনিক চাকুরির মাহিনা নিয়ে শহীদ হন না, বরং মাতৃভূমির রক্ষার জন্য বীরগতি প্রাপ্ত হন এই কথা বোঝার ও বোঝানোর প্রয়োজন আছে।

'যদি ভারতে মাতৃজাতির মধ্যে সীতা, সাবিত্রীর পুনর্জন্ম ঘটে, আধুনিক যুগের উপযোগী হয়েই তাঁদের আসতে হবে। সেই প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস, সাহস, দৃঢ়তা এবং ত্যাগসহ নূতন নামে গান্ধারীর পুনরাবির্ভাব ঘটুক; দময়ন্তী আবার প্রত্যাবর্তন করুন; ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহধর্মিণী দ্রৌপদীরও নবরূপে পুনরাগমন হোক; হে ভারতের নারী, জাগো জাগো!'

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

বাংলাদেশে ব্লগার হত্যার নেপথ্যে

ব্লগার অভিজিৎ রায় খুন হয়ে পড়ে রয়েছেন রাস্তায়, পাশে সাহায্যের আর্তি জানাচ্ছেন আহত স্ত্রী।

ধীরেন দেবনাথ

বাংলাদেশে একের পর এক 'ব্লগার' হত্যা হয়েই চলেছে। ইতিমধ্যেই ৫/৬ জনকে হত্যা করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে আহমেদ হায়দার রাজীব, আমেরিকা নিবাসী বাংলাদেশি ড. অভিজিৎ রায়, ওয়াশিকুর রহমান বাবু, অনন্ত বিজয়দাস এবং আপাতত সর্বশেষ নীলাদ্রি চট্টোপাধ্যায় (নিলয় নীল)। উল্লেখযোগ্য, ইতিপূর্বে বাংলাদেশের দুই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব কবি শামসুর রহমান ও শিক্ষাবিদ ড. হুমায়ুন আজাদ খুনিদের দ্বারা আক্রান্ত হলেও সৌভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে যান। তবে তাঁরা ভীষণভাবে আহত হন।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের অভিমত, আক্রমণকারী ও খুনিরা সশস্ত্র ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী। এরা মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক, ধর্মান্ধ, বাংলাদেশ বিরোধী, পাক-পন্থী, স্বাধীনতার শত্রু, জেহাদি, আই এস আই ও বিশ্ব ইসলামিক জঙ্গি সন্ত্রাসবাদীদের মদত ও সাহায্যপুষ্ট। এদের লক্ষ্য বাংলাদেশকে একটি 'প্যান ইসলামিক' রাষ্ট্রে পরিণত করা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ বিরোধী রাজাকার, আলবদর ও আলশামস্‌দের নতুন সংস্করণ এরা। তাই বেছে বেছে এরা খুন করছে বাঙালি জাতীয়তাবাদী, অসাম্প্রদায়িক বুদ্ধিজীবী, স্বাধীনতা সংগ্রামী, মৌলবাদ ও ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ বিরোধী এবং মুক্তমনা ব্যক্তিদের। এরা জঙ্গি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং এ কাজের জন্য মোটা অঙ্কের মাসমাইনে পায় পাকিস্তানসহ কিছু ইসলামিক দেশ, বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী তথা ইসলামিকদলগুলি বিশেষত জামাতে ইসলামির কাছ থেকে। জামাতে ইসলামি এমন একটি দল যার রয়েছে নিজস্ব ব্যাঙ্ক (ইসলামিক ব্যাঙ্ক), বীমা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরিবহন সংস্থা, নির্মাণ শিল্প।

সংবিধানগত ভাবে বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ হলেও সেদেশে স্বাধীনতার চার দশক পরেও ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ যে কতটা শক্তিশালী তার প্রমাণ বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচনের দিন এবং পরবর্তী দিনগুলিতে অসহায়, নিরীহ ও নিরপরাধ সংখ্যালঘুদের উপর ক্রমাগত পৈশাচিক নির্যাতন, লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ। তারপর নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পুনর্নির্বাচনের দাবিতে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি-নেতৃত্বাধীন বিশদলীয় জোট প্রায় তিন মাস সরকার বিরোধী হরতাল ডেকে, যাত্রী বোঝাই বাস ও পণ্যবোঝাই লরিতে পেট্রোলবোমা ছুঁড়ে মানুষ পুড়িয়ে, পণ্য জ্বালিয়ে এবং যানচলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃত্রিম সঙ্কট ও জনরোষ সৃষ্টি এবং ব্লগারদের নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করে, যা সরাসরি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সামিল। ইতিপূর্বে ২০০২ সালের সংসদ নির্বাচনে বিএনপি জোট ক্ষমতা দখল করলে সংখ্যালঘুদের উপর নেমে আসে অনুরূপ নির্যাতন এবং হত্যালীলা। পাকিস্তান, আমেরিকা ও সৌদি আরবপন্থী বিএনপি বাংলাদেশের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও তারা সাম্প্রদায়িক, ভারত বিদ্বেষী, জামাত জঙ্গিদের মদতদাতা এবং ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের বিরোধী। তাদের মন্ত্রিসভায় ছিলেন একাধিক জামাত ও মুসলিম লিগের মন্ত্রী, যাদের কেউ ইতিমধ্যেই মৃত, কেউবা আদালতের বিচারে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে ফাঁসির আসামি। বিএনপি-র রাজত্বে সংখ্যালঘুরা হয়েছে সবচেয়ে বেশি অত্যাচার ও নিগ্রহের শিকার। তারা পুলিশ-প্রশাসনের কাছ থেকে পায়নি যেমন সাহায্য ও সহানুভূতি, তেমনি আদালতেও সর্বদা পায়নি সুবিচার। কারণ প্রায় ১৫ বছরের সামরিক শাসন ও ১০ বছরের বিএনপি-জামাতের শাসনকালে পুলিশ-প্রশাসন এবং আদালতে যারা নিয়োগ পেয়েছেন তাদের প্রায় সবাই সামরিক শাসক ও জামাত- বিএনপি পন্থী তথা মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক। তাই এদের কাছে সংখ্যালঘুদের সুবিচার পাওয়া 'অরণ্যে রোদন' মাত্র।

তবে বর্তমান শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন চৌদ্দ দলীয় জোট সরকারও যে 'ধোওয়া তুলসীপাতা' তা কিন্তু নয়। এরা মুখে অসাম্প্রদায়িকতার কথা বললেও এদের রাজত্বেও যে সংখ্যালঘু বিশেষত হিন্দুরা শান্তিতে নেই তা বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ঘটনা, নির্বাচনের পর ব্যাপক হিন্দু নির্যাতন এবং সাম্প্রতিককালের ব্লগার হত্যা তারই প্রমাণ। সত্যি বলতে কী, মুজিব-হাসিনার রাজত্বকালে

আওয়ামি লিগের বহু নেতা-মন্ত্রী কিন্তু সবচেয়ে বেশি হিন্দু-সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছেন। শত্রু সম্পত্তি যার পোশাকি নাম পরিত্যক্ত সম্পত্তি (Abandoned Property)-কে হাতিয়ার করে তাঁরা এই কুকর্ম করেছেন। এছাড়াও জালিয়াতি, ভীতি প্রদর্শন ও বলপূর্বক অসংখ্য হিন্দুকে করা হয়েছে তাদের সম্পত্তি থেকে উৎখাত, অনেককে করা হয়েছে ভিটে-মাটি ছাড়া এবং বহু সংখ্যককে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে। বাংলাদেশের একাধিক তদন্ত রিপোর্টে এসব প্রকাশ পেয়েছে। হাসিনা-সরকারের এসব যে অজানা তা নয়। কিন্তু সরকার এহেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে অপারগ। কারণ তা করতে গেলে দলে বিদ্রোহের আশঙ্কা রয়েছে। অবশ্য শুধু যে আওয়ামি লিগের নেতা-মন্ত্রীরাই হিন্দু-সম্পত্তি আত্মসাৎ কাণ্ডে জড়িত তা নয়, হাসিনার মেয়ের শ্বশুর (যিনি আবার দলীয় এমপি) ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের প্রচুর সম্পত্তি এবং রাজেন্দ্রবাবুর নিজ বসতবাড়িটিও দখল করে আছেন। এমন ঘটনা রয়েছে আরও অনেক। অর্থাৎ 'সর্ষের মধ্যেই ভূত।' তবে কম যান না বিরোধী দলগুলির নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রীদের একটা বড় অংশ। সামরিক ও বিএনপি-জামাত শাসনকালে ওই সব নেতা-মন্ত্রী গ্রাস করেছেন হিন্দুদের ভূ-সম্পত্তি। হিন্দুদের জমি-জায়গা, ঘর-বাড়ির বেআইনি দখলদারিতে তারাই শ্রেষ্ঠ। তাই শত্রু-সম্পত্তি আইন বাতিল নিয়ে হাসিনা মুখ খুলছেন না। বেআইনিভাবে দখল করা হিন্দুদের সম্পত্তি ফেরতের প্রশ্নেও তিনি চুপ। এই ঘটনায় বাংলাদেশে হিন্দুরা রয়েছে আতঙ্কের মধ্যে। আসলে, বাংলাদেশে কোনো সরকারই হিন্দুদের আর ধর্তব্যের মধ্যে আনছে না। কারণ সেদেশে হিন্দুরা মোট জনসংখ্যার মাত্র ৮ শতাংশ। দেশভাগের সময় এটা ছিল ৩০ শতাংশেরও বেশি। তাহলে বাকিরা কোথায় গেল? নিঃসন্দেহে এ বঙ্গে, এ ভারতে। আর তাদের অধিকাংশ হিন্দুত্ব ভুলে কমিউনিস্ট সেকুলারদের ঝাঁকে মিশে গেছেন। চমৎকার হিন্দু! আশ্চর্যের বিষয় এই, ও বঙ্গে সংখ্যালঘু হিন্দুদের সংখ্যা ক্রম- হ্রাসমান। কিন্তু এ বঙ্গে সংখ্যালঘু (?) মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। তাই প্রশ্ন, এ বঙ্গ আর একটা 'বাংলাদেশ' হতে আর কত দিন?

আপাতত শেষ খুন নিলাদ্রি চট্টোপাধ্যায়।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অনুমান, জামাতের সঙ্গে হাসিনা সরকারের একটা গোপন বোঝাপড়া আছে। হাসিনা মুখে জামাত বিরোধী হলেও কাজে তা মিলছে না। আর একথা যে মিথ্যে নয় তার রয়েছে বহু প্রমাণ। যেমন— '৭১-এর চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধী এবং পিরোজপুরের কুখ্যাত জামাত-রাজাকার মওলানা দেলোয়ার হোসেন সাইদির প্রায় অর্ধ ডজন অপরাধ আদালতে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও ফাঁসির বদলে হয়েছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। যদিও এহেন অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যদের হয়েছে ফাঁসি। এনিয়ে বাংলাদেশে সরকারের বিরুদ্ধে কম সমালোচনার ঝড় ওঠেনি। তাহলে প্রশ্ন, কে এই সাইদি? সাইদি হচ্ছেন জামাতের শীর্ষ নেতৃত্বের একজন। জামাতে তাঁর অনুগামীর সংখ্যা প্রচুর। ভাল বক্তা। অনুগামীদের কাছে তিনি ফেরেস্তা। আর তাইতো তারা প্রচার করেছে যে, চাঁদের মধ্যে তাঁর মুখচ্ছবি দেখা গেছে। এমন কী তাঁদের বিশ্বাস, মওলানা সাহেব কোনো অপরাধ করতেই পারেন না, সবই সাজানো। তাই তারা সরকারকে হুমকি দিয়েছে— তাদের নেতার ফাঁসি হলে বাংলাদেশে আগুন জ্বলবে। ব্যস্ হুমকিতেই সরকার চুপ। অশান্তি ঠেকাতে তাই সাইদির বিরুদ্ধে সরকার আদালতে সদর্থক বা ইতিবাচক পদক্ষেপই নেয়নি। ফলশ্রুতিতে আটকে যায় তাঁর ফাঁসির আদেশ। মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার মুক্তমনা ব্লগারদের নামের তালিকা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে থাকা সত্ত্বেও তাঁদের নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা করেনি কেন? এ প্রশ্ন গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষদের। জামাতের বড় শত্রু 'গণজাগরণ মঞ্চ'-এর সমর্থক এই ব্লগাররা। কিন্তু জামাতের সন্ত্রাস ও স্বাধীনতার শত্রুদের বিরুদ্ধে সরকার নিষ্ক্রিয়— এই অভিযোগ গণ জাগরণ মঞ্চের। মঞ্চ ও সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, সরকারের সমালোচক বলেই কী সরকার ব্লগারদের নিরাপত্তা দিচ্ছে না? উলটে প্রধানমন্ত্রী হাসিনা ও তাঁর মন্ত্রীরা প্রচার করে বেড়াচ্ছেন, কারও ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দেওয়া উচিত নয়। অনেকের ধারণা, এসব কথা বলে সরকার পক্ষ একদিকে যেমন ব্লগারদের সতর্ক করছে, অন্য দিকে তেমনি মূল সমস্যাকে এড়িয়ে গিয়ে জনগণের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। আর এর দ্বারা সরকার মারছে এক ঢিলে দুই পাখি। অর্থাৎ ব্লগারদেরও পরোক্ষভাবে সতর্ক করা হচ্ছে এবং জামাতকেও খুশি রাখা যাচ্ছে। তাছাড়া এতসব কাণ্ডের পরেও এবং আইনি বাধা না থাকা সত্ত্বেও সরকার জামাতকে নিষিদ্ধ করছে না। বরং বাংলাদেশে জামাতের তাণ্ডব, সন্ত্রাস ও খুনোখুনি জিইয়ে রেখেছে হাসিনা সরকার।

ব্লগার খুনের পর প্রতিবারই বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। নিলয় খুনের পরেও উঠেছে। বিভিন্ন দেশ, রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল নিলয় খুনের তীব্র নিন্দা করেছে। আমেরিকা, বৃটেন ও রাষ্ট্রসঙ্ঘ দোষীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছে। এমনকী, তদন্তে সহযোগিতারও আশ্বাস দিয়েছে। আসলে এসবই কথার কথা। সরকার ও পুলিশ যদি সক্রিয় না হয় তবে কার কী করার আছে? সদিচ্ছার অভাবেই তো মূল অভিযুক্তরা ধরা পড়ছে না। আর এখানেই সরকার-জামাত যোগের সন্দেহকে প্রকট করছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান ধর্মান্ধ। জামাত-সহ অন্যান্য ইসলামিক দলগুলি তার সুযোগ নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। ষড়যন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় দুটি— (১) বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করা, (২) জেহাদের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করা। ব্লগার খুনের নেপথ্যে রয়েছে সেই জেহাদি ষড়যন্ত্র। অথচ সরকার নির্বিকার। ■

জ্যোতিষশাস্ত্র স্বদেশে ব্রাত্য, ইউরোপ-আমেরিকায় পাঠ্য

অশোক কুমার মণ্ডল

শাশ্বত-সনাতন ভারতবর্ষ মুনি-ঋষিদের তপস্যার ক্ষেত্র, যোগ সাধনার পীঠস্থান, মহামানবের লীলাক্ষেত্র। শিক্ষা-সাহিত্য-বিজ্ঞান- ধর্ম-দর্শন- রাজনীতি-কৃষ্টি-সংস্কৃতি তথা বিশ্বমানবতার উজ্জ্বলতায় ভারতবর্ষ সারা বিশ্বকে সমৃদ্ধ করেছে— যা গর্ব ও গৌরবের বিষয়।

বর্তমান সময়ে বেদ-বেদান্ত-গীতা-উপনিষদ-মহাকাব্যের সারমর্ম, শত-সহস্র মহামানবের কর্ম ও বাণী অনেকাংশে নিষ্প্রভ, চলার পাথেয় বা আদর্শ মনে হয় না। বিপরীতভাবে বলা যায় সামাজিক পরিস্থিতি হৃদয়বিদারী, উদ্বেগজনক। বুদ্ধির মান ও জ্ঞানান্বেষণের স্পৃহা অধোগামী। পাশ্চাত্য বেনো জলের প্রভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলপটকা মন্তব্য করতেও পিছপা হচ্ছি না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, শ্রীরামচন্দ্র বহুপত্নীক, বঙ্কিমচন্দ্র সাম্প্রদায়িক, সংস্কৃত মৃতভাষা, ক্ষুদিরাম সন্ত্রাসবাদী, সর্বোপরি জ্যোতিষশাস্ত্র ভাঁওতা (অবৈজ্ঞানিক) ও জ্যোতিষী ভণ্ড ইত্যাদি। শ্রদ্ধা-ভক্তি-মর্যাদার বিষয়ে কুরুচিকর মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক, আপত্তিকর ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই এই ছোট লেখার অবতারণা।

জ্যোতিষশাস্ত্রকে ভাঁওতা বলায় অর্থ বেনহ্যাম, গর্গ, পরাশর, কশ্যপ, মনু, ভৃগু, বরাহমিহির, অ্যালানলিওকে পরোক্ষভাবে ভণ্ড, প্রবঞ্চক আখ্যা দেওয়া। বৈদিক যুগ থেকে চলে আসা জ্যোতিষ প্রাচীন শাস্ত্র। জ্যোতিষশাস্ত্রের অনেক বিভাগের মধ্যে Mundane (মানব সংক্রান্ত) Astrology-তে Natal Horoscope making is fully depends on planatory position from the accurate time and place of birth of the native —বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড নির্দিষ্ট নিয়মে ঘূর্ণায়মান। হঠাৎ কোনো কিছু ঘটে না। মানব জীবনেও নয়। যা ঘটে গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে।

প্রথম জ্যোতির্বিদ শেঠ সূর্য-সহ সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রের গতি ও গতিপথ নির্ণয় করে (৩৭৬৯ বি.সি.) একটি বছরকে ১২টি ভাগে ভাগ করে পূর্ণচন্দ্রের গতি অনুসারে (পৃথিবীর চারিদিকে) ১২টি রাশি স্থির করেন। গ্রহ-নক্ষত্রের গতি পরিমণ্ডল সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক। অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি প্রমাণ সাপেক্ষে স্থিরীকৃত সত্যে বা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই 'বিজ্ঞান'। নতুন নতুন গ্রহ-নক্ষত্রের আবিষ্কার ঘটছে। তাদের গতিপথ পরিবর্তনে স্থান পরিবর্তন ঘটে।

কালের গণ্ডী অতিক্রম করে নির্ভুল জ্যোতিষ গণনায় নক্ষত্ররাজির ক্রমপরিবর্তনে শুদ্ধতা প্রয়োজন। কোনো জ্যোতিষীর গণনায় ভুল হলে সেই শাস্ত্রের দোষ হয় না— দোষ ফলাদেশকারীর। শাস্ত্রের প্রকৃত মর্মার্থ অনুধাবন পূর্বক সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। অনেক ক্ষেত্রে সাধক জন্ম সময়ের পরিবর্তে ভুল জন্ম সময়ের কারণে ফলাদেশে ভিন্নতা ঘটা স্বাভাবিক। সীমিত জ্ঞান ও ধারণায় তথাকথিত জ্যোতিষীগণ ব্যবসায়িক মনোভাবে জ্যোতিষশাস্ত্রের অমর্যাদা করেন। তারা 'অপুষ্টি ফলের' সমান। বিষয়ের সম্যক জ্ঞান-চিন্তন-অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা ব্যতীত নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব নয়। মনে করা যাক, দু'জন জ্বরে আক্রান্ত। একজন ৪/৫ দিনেই সুস্থ, অপরজনের সুস্থ হতে ২৪/২৫ দিন সময় লাগল। একই ওষুধ, একই ডাক্তার অথচ উভয়ের আরোগ্যলাভে ভিন্নতা দু-রকম, এই ঘটনায় চিকিৎসাশাস্ত্রকে অবৈজ্ঞানিক বলা কি যুক্তিযুক্ত? বিজ্ঞান সর্বদা বিজ্ঞান। তার প্রয়াগ ঘটে মানুষের মাধ্যমে, সেখানে সীমাবদ্ধতা থাকে। সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল থেকে অনেকে আরোগ্য লাভ করেন। কেউ কেউ আবার Cremation Ground-এ যান। উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রাপ্ত আবহাওয়ার পূর্বাভাস সবক্ষেত্রে মেলে কি? বহু বছরের গবেষণায় একাধিক ব্যর্থতার পর চন্দ্র ও মঙ্গল গ্রহ অভিযান সফল হয়।

গবেষণায় ত্রুটির কারণে রকেট উৎক্ষেপন ব্যর্থ হয়, ভারতের ক্ষেত্রেও হয়েছিল। মহাকাশ অভিযান পারমাণবিক গবেষণায় সাফল্য আজও বহু দেশের আয়ত্তের বাইরে কেন? Manual Calculation- এর ত্রুটি না বিজ্ঞানের দোষ? জ্যোতিষশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। শ্রদ্ধেয় অটলজী ও মোদীজীর চেষ্টায় জ্যোতিষশাস্ত্র কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু হলেও আমেরিকা-জার্মান-ফ্রান্স-সুইজ্যারল্যান্ডে জ্যোতিষশাস্ত্র স্কুল-কলেজে পাঠ্য। অবৈজ্ঞানিক বিষয় হলে উন্নত দেশগুলোতে সমাদর লাভ সম্ভব হোত কি?

পরিশেষে বলা যায়, ক্যালকুলেশন করে রাশিচক্র Natal Horoscope তৈরি হয়। গণনা বা ফলাদেশ সম্পূর্ণ নিজের। গ্রহ-নক্ষত্রের বৈশিষ্ট্য, রাশিচক্রে জন্মকালীন ও বর্তমানে তাদের অবস্থান, পরস্পর শত্রুমিত্র সম্পর্ক, দশা-অন্তর্দশার নিরিখে বিশ্লেষণ ও চিন্তন ও উপলব্ধির পর ফলাদেশ করা উচিত। যত বেশি ছকের বিশ্লেষণ তার ততবেশি Perfection। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, ডাঃ বিধান রায়ের M.B.B.S. ডিগ্রি না থাকলেও তিনি দেখেই রোগ নির্ণয় করতেন, তেমন সফল জ্যোতিষীর এমন Intution থাকা চাই, যা সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতালব্ধ ও নিজস্ব। কপটাচারে শাস্ত্রের অবমাননা নয়, জ্যোতিষ শাস্ত্রের উজ্জ্বল দ্যুতিতে ভারতের আকাশ পুনর্বার পবিত্র ও নির্মলতায় পরিপূর্ণ হোক— সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষায়।

(লেখক প্রবীণ শিক্ষক)

থাকে যদি
'ডাটা',
জমে যায় রান্নাটা
ডাটা®
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়
কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন
DUTA
TURMERIC POWDER
CHILLI POWDER
Kasuri Methi
pure INDIAN SPICES
Krishna Chandra Dutta (Cookme) Pvt. Ltd.
207 Maharshi Debendra Road, Kolkata 700007
email : dutaspice@gmail.com

সবজি বেচে হাসপাতাল

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সবজি বেচে হাসপাতাল! শুনতে আশ্চর্য লাগলেও ঘটনাটি সত্যি। সারাজীবনের সঞ্চয় দিয়ে একটি হাসপাতাল নির্মাণ করেছেন সবজি বিক্রেতা এক বৃদ্ধা। তিনি শুভাষিণী মিস্ত্রী। বাজারে সবজি বিক্রি করে তিল তিল করে তিনি সঞ্চয় করেছেন সেই অর্থ।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার হাঁসপুকুরের শুভাষিণী দেবীকে এককথায় সকলে চেনেন। কলকাতার ঠাকুরপুকুর থেকে বেশ কিছুটা দূরে হাঁসপুকুর। বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর স্বামীর হাত ধরে এখানেই এসে উঠেছিলেন শুভাষিণী মিস্ত্রী। পেশায় দিনমজুর স্বামীর কুঁড়ে ঘরকেই আপন করে নিয়েছিলেন। স্বামী-পুত্র নিয়ে ভালোই দিন কাটছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালে চিকিৎসার গাফিলতিতে স্বামীর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৩ বছর। সেই থেকে শুরু হয় সংগ্রামের পথে চলা। স্বামী ইহলোক ত্যাগ করার পর চার পুত্রকে মানুষ করে তোলাই ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। অবশেষে তিনি বাজারে সবজি বেচতে শুরু করেন। সবজি বেচেই ছেলেদের লেখাপড়া চালাতে থাকেন তিনি। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি মনে মনে ঠিক করেন আর কোনো গরিব মানুষকে টাকার অভাবে মরতে দেবেন না। তাই তিনি একটি হাসপাতাল তৈরি করার চিন্তাভাবনা শুরু করেন। কিন্তু পেশায় সবজি বিক্রেতার এহেন স্বপ্ন কতটা সফল হবে তা নিয়ে সন্দিহান ছিলেন প্রতিবেশী ও আত্মীয়রা। পাশাপাশি মেজ ছেলেরও স্বপ্ন ডাক্তার হওয়ার। সুতরাং ছেলেকে ডাক্তার করা এবং হাসপাতাল তৈরি— দু'টি স্বপ্নই তিনি দেখতে থাকেন।

হিউম্যানিটি হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিষ্ঠাতা শুভাষিণী মিস্ত্রী।

সবজি বিক্রির সামান্য আয় থেকেই ঘরভাড়া, খাওয়া-দাওয়া, তারপর কিছু সঞ্চয় করা। এর পিছনে তাঁর একটাই ভাবনা, 'গরিবকে আর এভাবে মরতে দেওয়া যাবে না, তাদের জন্য একটা কিছু করতে হবে।' শুভাষিণী দেবীর এই ইচ্ছা অনেকটা ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখার মতন। তা সত্ত্বেও হার মানেননি, প্রতিজ্ঞা এবং অদম্য জেদকে সঙ্গী করে তিনি এগোতে শুরু করেন।

এই ভাবে এক সময় তিনি ১ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করেন। তা দিয়েই কেনে হাসপাতালের জন্য এক একর জমি। অন্যদিকে মেজ ছেলে অজয়ও পাড়াপ্রতিবেশী এবং মায়ের অদম্য চেষ্টায় ডাক্তারি পাশ করেন। অবশেষে ২০ বছরের পরিশ্রমের ফল পান তিনি। হাঁসপুকুরে হাসপাতাল গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন প্রাথমিকভাবে। ৪০ বছর ধরে জিইয়ে রাখা তাঁর স্বপ্ন সফলতার দিকে এগোতে থাকে। সেই জমিতেই একটি কুঁড়ে ঘর করে সদ্য ডাক্তারি পাশ করা তাঁর ছেলে অজয় গরিব লোকের চিকিৎসা করা শুরু করেন। অজয়বাবুর ডাক্তার বন্ধুরাও এগিয়ে আসেন বিনা পারিশ্রমিকে গরিবদের চিকিৎসার জন্য। প্রথমদিন চিকিৎসার জন্য এসেছিল ২৫২ জন রোগী। সেদিন রোগীদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কেঁদে ফেলেছিলেন শুভাষিণী মিস্ত্রি। মনে পড়ছিল তাঁর স্বামীর কথা। এই কাজে এখন বহু মানুষকেই পাশে পেয়েছেন শুভাষিণী দেবী। ১৯৯৩ সালের ছোট্ট কুঁড়ে ঘরটি আজ বহুতলে পরিণত হয়েছে। চিকিৎসক সংখ্যাও প্রায় পঞ্চাশজনের উপর। হাসপাতালে শয্যার সংখ্যাও প্রায় শতাধিক। ∎

ARE YOU SEARCHING FOR A PROPERTY PLANNER ?

PROPERTY

BUY SALE RENT

Contact
DILIP KUMAR JHAWAR 9831172945
RANAJIT MAZUMDAR 9339861465

S M WEALTH INFRAREALTOR LLP | 52 /E BALLYGUNGE CIRCULAR ROAD, KOLKATA 700019
Email : info@smwealth.co | Web Link : www.smwealth.co

ভিন্ন একুশ
জীবন্ত ইতিহাসের অনুসন্ধান

পুস্তক প্রসঙ্গ

ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত একুশটি নিবন্ধের সংকলন গ্রন্থ 'ভিন্ন একুশ'-এ এক আত্মপ্রত্যয়ী, মরমি লেখকের পরিচয় পেলাম। সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের টুকরো টুকরো খণ্ড চিত্রের নিপুণ সমন্বয় ঘটেছে লেখাগুলির নির্মাণে। আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের বিভিন্ন ব্যক্তির চেতনার বিন্যাস ফুটে উঠেছে লেখকের সাবলীল লেখনীতে।

লেখক একুশটি নিবন্ধকে পাঁচটি শ্রেণীতে গেঁথে তুলেছেন। এই পাঁচটি শ্রেণী হলো— মানুষের অধিকারে, সামাজিক ভাবনাপট, ইতিহাসের পাতা, চলচ্চিত্রের আলোছায়া ও সাহিত্য পথ। মানবিক মূল্যবোধ ফুটে উঠেছে মার্টিন লুথার কিং, এমেলাইন প্যাঙ্কহার্স্ট, অশ্বিনী কুমার দত্ত, হ্যারিয়েট বিচার স্টো শীর্ষক নিবন্ধগুলিতে। জাতীয় আন্দোলনের পরিসরে অশ্বিনী কুমার দত্ত'র সামাজিক, মানবিক ও দেশপ্রেমের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ প্রতিফলিত হয়েছে। আর বর্ণবৈষম্যবাদের অভিশাপের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুই শতকের প্রতিনিধি হ্যারিয়েট বিচার স্টো ও মার্টিন লুথার কিং-য়ের অবদান নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। ১৯৬৩ সালের 'ওয়াশিংটন মার্চ' বিশ্ব ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিকচিহ্ন। লেখক যখন প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, সে সময় বারাক ওবামা নামক কৃষ্ণাঙ্গ রাজনীতিবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হননি। নারী অধিকার তখন সামাজিক ইতিহাসের পরিসরে বিশেষ স্থান অর্জন করেছে। নারী অধিকারের অন্যতম প্রধান দিক ভোটাধিকারের স্বীকৃতি। নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রতীক এমেলাইন প্যাঙ্কহার্স্ট-এর অসমসাহসী সংগ্রামের ফলেই এই অধিকার বাস্তবায়িত হয়। 'সামাজিক ভাবনা পট'-এ যেসব লেখা গ্রন্থিত হয়েছে, সেগুলিতে তীব্র সমাজবোধ ও শ্লেষ ধরা পড়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'পয়লা বৈশাখ' ভুলে যাওয়ার মধ্যে বাঙালি মননে নিজ সংস্কৃতির প্রতি সচেতন নিরাপত্তার মধ্যে লেখক 'আত্ম প্রবঞ্চনা' দেখেছেন। আর ডায়নার মৃত্যু সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে 'ব্যাভিচারী' জীবন বাজারি বিপণনের পণ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। রাজনৈতিক কার্টুন প্রসঙ্গে শাসকমহলের বিরূপতা লেখক তীক্ষ্ণ শ্লেষের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। ইতিহাসের পাতায় কোহিনুর, জাদুকরি হুডিনির কথা পাঠকমনকে ইতিহাসের রোমন্থনে চালিত করে।

'চলচ্চিত্রের আলোছায়া' যেসব নিবন্ধ স্থান পেয়েছে তার মধ্যে 'শতবর্ষে ভারতীয়

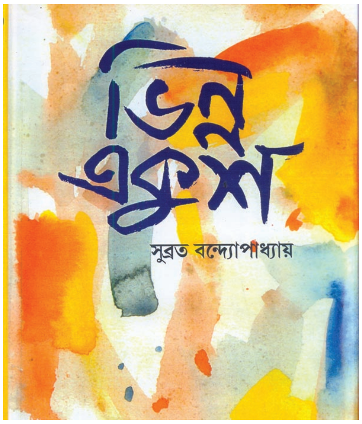

চলচ্চিত্রের অভিযান'-এর কথা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ১৯১৩ সাল থেকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের একশো বছরের গতিপথ লেখক সাবলীল ভাবে চয়ন করেছেন। আঞ্চলিক ছবি কীভাবে ভারতীয় ও বিশ্বজনীন প্রভাব ফেলেছে সে প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, আদুর গোপালকৃষ্ণন, গিরিশ কারনাড-এর ভূমিকা স্মরণীয়। আবার এম জি রামচন্দ্রন, এন টি রামারাও ও জয়ললিতা চলচ্চিত্রে সাফল্যের সুবাদে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে শিখরে উঠেছেন। অভিনেতা থেকে নেতায় উত্তরণ ঘটেছে আরো অনেকের। গত লোকসভা নির্বাচনে বাংলার থেকে অনেক তারকাই নিজের স্থান করে নিয়েছেন। ঋত্বিক ঘটক সম্পর্কে আলোচনায় লেখক দেখিয়েছেন চলচ্চিত্র কীভাবে ইতিহাসের স্মৃতি রোমন্থনে সহায়ক হয়। লেখকের আলোচনায় দাদাসাহেব ফালকে ও হিচকক-এর কালজয়ী অবদান বিধৃত করেছেন। আর ছবি কীভাবে দেশীয় স্বাভিমান ও চেতনার আধার হতে পারে তার প্রমাণ মেলে 'জাতীয়তাবাদ' সংক্রান্ত লেখায়।

গ্রন্থটির শেষ পর্বে 'সাহিত্য পথ'-এর লেখাগুলিতে লেখক আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সাহিত্যের ভূমিকা আলোচনা করেছেন। তারাশঙ্কর সংক্রান্ত লেখায় দেখানো হয়েছে যে মার্কসবাদ সমাজ ও মানুষের সঠিক দর্পণ নয়, শ্রেণী সংগ্রামের আড়ালে দপ্তরের কদর্যরূপটি প্রাধান্য পায়। পশ্চিমবাংলার মানুষ অভিজ্ঞতার নিরিখে এই সত্য হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছেন। প্রকৃত সাহিত্যিক যে মিথ্যার আবরণ মেনে নেন না একথা প্রমাণিত নোবেল জয়ী নইপাল, সলমন রুশদি ও তসলিমা নাসরিন-সংক্রান্ত রচনা গুলিতে। সলমন রুশদি প্রসঙ্গে লিখেছেন, "তিনিই স্বাধীনোত্তর যুগে একাদিক্রমে চলে আসা মুসলমান তোষণবাদ এবং ওই ধর্মের কুপ্রথা ও কদাচারগুলির দিকে বুক ঠুকে তাঁর লেখার মাধ্যমে আঙুল তুলেছিলেন। রুশদি ও তসলিমা কীভাবে মৌলবাদীদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়েছেন তা সকলের সুবিদিত। পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তসলিমাকে সুকৌশলে পশ্চিমবাংলা থেকে বিতাড়িত করেছিল। মৌলবাদী গর্জনের কাছে নতিস্বীকার মানবতার উপর চরম আঘাত।

শেষ লেখা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রসঙ্গে। সুনীলবাবুর মতো শীর্ষস্থানীয় লেখক কিন্তু সংকীর্ণতার পরিসর থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি।

ভিন্ন একুশের সবকটি লেখাই ভাষার সাবলীলতা ও বক্তব্যের শাণিত ভঙ্গিমা পাঠকদের মনে চিন্তার খোরাক জোগাবে। গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন সাহিত্যিক রমানাথ রায়। তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলি, 'সুখপাঠ্য নিবন্ধগুলি পাঠকদের কাছে সমাদৃত হলে খুশি হব।' প্রকাশক সূত্রধর-এর আন্তরিক প্রচেষ্টার ছাপ রয়েছে প্রচ্ছদে ও প্রকাশনার বিন্যাসে।

ভিন্ন একুশ— লেখক : সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক : সূত্রধর। ৭৪/বি, বোসপাড়া লেন কলকাতা-৭০০০০৩।

সমাবেশ সমাচার

জলপাইগুড়িতে 'সক্ষম'-এর শুভারম্ভ

প্রতিবন্ধীদের সমাজের বোঝা নয়, বরং সম্পদ মনে করে সমদৃষ্টি, ক্ষমতা বিকাশ এবং অনুসন্ধান মণ্ডল সংক্ষেপে 'সক্ষম' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মহারাষ্ট্রের নাগপুরে। অক্ষম ব্যক্তিদের সমাজের মূল স্রোতে নিয়ে আসার জন্য সংগঠনটি কাজ করে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই গত ২৯ জুন, হেলেন কেলারের জন্মদিনে জলপাইগুড়িতে সক্ষমের শুভারম্ভ হয় সর্বভারতীয় সংগঠন সাধারণ সম্পাদক সুকুমারজীর তত্ত্বাবধানে।

এই কার্যক্রমের অঙ্গ হিসেবে সেদিন জলপাইগুড়ির সমাজ পাড়া মুক্তাভবন মোড় থেকে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে সকাল ৯টায় এক শোভা যাত্রার আয়োজন করা হয়। এই শোভাযাত্রায় ট্যাবলো এবং ব্যাণ্ডের মাধ্যমে শহর পরিক্রমা করে। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শোভাযাত্রাটির শুভারম্ভ করেন শিল্পপতি রাজেন গোয়েল। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন প্রদীপ চন্দ্র। এছাড়া ছিলেন প্রাক্তন ডি.আই.এফ (এস.এস.বি) সত্যলাল সরকার। এঁদের উত্তরীয় পরিয়ে বিশেষ সম্মান প্রদান করা হয়। শোভাযাত্রায় বৃহন্নলা সম্প্রদায়ের মানুষও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন উত্তরবঙ্গের সক্ষমের আহ্বায়ক চন্দন রায়। উপস্থিত ছিলেন ধর্মজাগরণ মঞ্চের প্রান্ত অধিকারী দেবাশিস লালা। সংস্থার সাংগঠনিক দিকের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন কর্ণদেব সাহা।

সিউড়িতে কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতা

কেউবা সুদর্শনধারী, কেউবা বংশীধারী, আবার কেউ মাখনচোর, কেউবা গোষ্ঠের রাখাল— শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর সকালে এমনই নানা রূপ খুদে কৃষ্ণদের দেখা মিললো সিউড়ি সিধু কানহু মুক্তমঞ্চে। উদ্যোক্তা সংস্কারভারতী সিউড়ি শাখা। নানারূপে খুদে শ্রীকৃষ্ণ দেখতে হাজির হয়েছিলেন আট থেকে আশি বছরের মানুষ। খুদে কৃষ্ণদের পোশাক, সাজসজ্জা, অভিব্যক্তি, ভঙ্গিমা, অভিনয় বিচার করে অভিভূত বিচারকরা। চিত্রশিল্পী সারথি দাস বলেন, ছোট্ট শিশুরা খুদে কৃষ্ণ নানারূপে সেজে, অভিনয় করে অঙ্গভঙ্গিমা করে আমাদের মুগ্ধ করেছে। সংস্থার সভানেত্রী লোকসঙ্গীত শিল্পী স্বপ্না চক্রবর্তী বলেন, আমরা গত ১০ বছর ধরে কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতার আয়োজন করছি। জন্মাষ্টমীর সকালে খুদে কৃষ্ণদের নিয়ে আমরা আনন্দে মেতে উঠি।

‘শ্রদ্ধা’র ৬৬তম শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ২৩ আগস্ট সিউড়ি নুড়াই পাড়া নিবাসী শ্রীশ্রী বগলাচাঁদ জীউ ঠাকুরের সেবাইত, শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীনিবাস ঠাকুরের বংশধর, বীরভূম জেলার ময়নাডাল গ্রামের প্রখ্যাত কীর্তনীয়া স্বর্গীয় গুরু নারায়ণ ঠাকুরের সুপুত্র পণ্ডিত প্রবর কৃষ্ণগোপাল ঠাকুরকে ‘শ্রদ্ধা’র বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে শুরুতে কালাচাঁদ ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণে কৃষ্ণগোপাল ঠাকুরের শ্রীহস্তে একটি কদম্ববৃক্ষ রোপণ করা হয়। এটি ‘শ্রদ্ধা’র কার্যক্রমের একটি অঙ্গ। অনুষ্ঠান তিনবার ‘ওঁ’ ধ্বনি দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। মঙ্গলদীপ প্রজ্বলন করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রাক্তন প্রচারক, বর্তমানে শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ চরণাশ্রিত সন্ন্যাসী স্বামী সত্যানন্দ পুরীমহারাজ। কৃষ্ণগোপাল ঠাকুরকে মাল্যদান করেন ভারতসেবাশ্রম সঙ্ঘের নবীন ব্রহ্মচারী শ্রীগৌতম মহারাজ। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী কাকলী দাস। মানপত্র পাঠ ও প্রদান করেন ‘শ্রদ্ধা’র অনুদানী লাউজোড় উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক জীবন কুমার মুখোপাধ্যায়। শ্রীঠাকুর মহাশয়কে অর্ঘ্যস্বরূপ বস্ত্র, নামাবলী, গীতা, ফল ও মিষ্টান্ন প্রদান করা হয়। ‘শ্রদ্ধা’র সভাপতি নিরঞ্জন হালদার (ছোটদা) শ্রীঠাকুরকে বনফুলের মালা নিজহস্তে রচনা করে পরিয়ে দেন। ‘শ্রদ্ধা’র পক্ষে প্রাস্তবিক ভাষণ দেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। ঠাকুর পরিবারের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন শ্রীঠাকুরের চতুর্থ ভাই প্রাক্তন শিক্ষক ও কীর্তন গানের মূল গায়েন গোবিন্দ গোপাল ঠাকুর। শ্রীঠাকুর মহাশয় প্রায় ১০ মিনিট সংস্কৃত ভাষায় তাঁর বক্তব্য রাখেন। তাঁকে পূজা করেন তাঁর বৌমা শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা ঠাকুর ও আরতি করেন ‘শ্রদ্ধা’র অনুদানী শুভ্রা ঘোষ। পরিশেষে কৃষ্ণগোপাল ঠাকুর ও তার ভাই গোবিন্দগোপাল উভয়ে কীর্তন গান পরিবেশন করেন। কার্যক্রমে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন শ্রীকৃষ্ণগোপাল ঠাকুরের সুসন্তান ও শ্রীঅরবিন্দপল্লী শিশু মন্দিরের আচার্য নির্মল ঠাকুর। অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সঞ্চালনা করেন সিউড়ি বেণীমাধব উচ্চবিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিক্ষক ও সাংবাদিক পতিতপাবন বৈরাগ্য। শান্তিমন্ত্র ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন ‘শ্রদ্ধা’র সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু।

বারুইপুরে শিক্ষক সঙ্ঘের জেলা সম্মেলন

গত ২৬ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের উদ্যোগে বারুইপুর সেবাভারতী কার্যালয়ে জেলা কার্যকারিণীর সম্মেলন উদ্বোধন করেন শিক্ষক সঙ্ঘের রাজ্য সম্পাদক দীনেশচন্দ্র সাহা। অনুষ্ঠানের সূচনায় স্বর্গীয় নারায়ণ চন্দ্র পালের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিভাগ প্রচারক বিজয় পাতর, বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের কার্যকর্তা পঙ্কজ কুমার নিয়োগী, বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের জেলা সম্পাদক কানুপ্রিয় দাস প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জীষ্ণু বসু। তাঁর হিন্দুত্ব ও ভারতের পূর্বপুরুষ সম্পর্কে আলোচনা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে শিক্ষক মহলে। দ্বিতীয় অধিবেশনে পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি— বিষ্ণুপদ মণ্ডল। সহ-সভাপতি— ইন্দ্রলাল প্রামাণিক। সম্পাদক— রঞ্জিত হালদার। সহ-সম্পাদক— সঞ্জয় সিনহা, কার্তিক মান্না। কোষাধ্যক্ষ— নারায়ণ পুরকাইত। আমন্ত্রিত সদস্য— উৎপল সরদার, অমলেন্দু সরকার, পরিতোষ দাস, চন্দন ভৌমিক, রাজকুমার মণ্ডল।

‘দত্তপন্ত ঠেংড়ী জীবন দর্শন’ গ্রন্থের প্রকাশ

গত ৩০ আগস্ট নিউ দিল্লীর এন ডি এম সি কনভেনশন সেন্টারে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের উদ্যোগে ‘দত্তপন্ত ঠেংড়ী সমগ্র’ প্রথম দুই খণ্ড বই-এর উদ্বোধন হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত বইটির উন্মোচন করেন। মোট নয়টি খণ্ডের মধ্যে প্রথম দুই খণ্ড প্রকাশিত হলো। প্রবীণ বিএমএস কার্যকর্তা অমরনাথ ডোগরা দত্তপন্ত ঠেংড়ী জীবন দর্শন হিন্দীতে সম্পাদনা করেন। সুরুচি প্রকাশনী সংস্থা থেকে প্রকাশিত প্রথম খণ্ডটির লেখক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক রঙ্গ হরি। পাশাপাশি তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডটিরও কাজ চলছে যা আগামী নভেম্বর মাসে (ঠেংড়ীজীর জন্ম শতবর্ষে) প্রকাশিত হবে। প্রথম খণ্ডের এই বইটিতে তাঁর শৈশব এবং বিএমএসে তাঁর ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডটিতে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ এবং তাঁর দৃষ্টিতে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ও রাজনীতি প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে।

সীমা জনকল্যাণ সমিতির রাখিবন্ধন

গত ২৯ আগস্ট সীমা জনকল্যাণ সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি তাপস কুমার বিশ্বাসের নেতৃত্বে ও জলঙ্গী ব্লক সভাপতি চিন্ময় মণ্ডল ও সম্পাদক রাহুল প্রামাণিকের উপস্থিতিতে জলঙ্গী ও রানীনগর ব্লকে রাখিবন্ধন উৎসব পালন করা হয়। সকাল থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানে জলঙ্গী কাস্টম অফিস থেকে কাহারপাড়া কাস্টম অফিস এবং ৯টি বি এস এফ ক্যাম্পের জওয়ানদের হাতে রাখি বাঁধা হয়। বি এস এফ জওয়ানরা আনন্দের সঙ্গে রাখি গ্রহণ করেন এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। এই অনুষ্ঠানে রানীনগর ব্লকের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন খোকন ভাদুড়ী। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসাবে ক্রীড়া জগতের শ্যামল কুমার মণ্ডল উপস্থিত ছিলেন।

রজনীকান্ত সেনের জন্ম সার্ধশতবর্ষে সংস্কারভারতী সিউড়ি শাখার শ্রদ্ধার্ঘ্য

কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের জন্ম সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে গত ২৩ আগস্ট সংস্কারভারতী সিউড়িশাখা আয়োজিত উৎসবে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন অভিনেতা অরিন্দম গাঙ্গুলী। বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন গৌড়ীয় নৃত্যসাধিকা ড. মহুয়া মুখোপাধ্যায়। অতিথিরূপে সভায় পথনির্দেশ করেন সংগঠনের অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক আমীর চাঁদ ও প্রাদেশিক উপদেষ্টা সুভাষ ভট্টাচার্য।

অনুষ্ঠানের সূচনায় প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্বলন করেন অভিনেতা অরিন্দম গাঙ্গুলী। সভায় অতিথিদের সংস্কারভারতীর পক্ষ থেকে সম্মাননা তুলে দেন শাখার সভানেত্রী স্বপ্না চক্রবর্তী। সাধক বামাক্ষ্যাপার চরিত্রে অসামান্য অভিনয়ের জন্য নটরাজ সম্মানে শ্রী গাঙ্গুলীকে সম্মানিত করা হয়। সম্মাননায় অবিভূত অরিন্দম গাঙ্গুলী বলেন, সংস্কারভারতীর এই সম্মান আমার জীবনে অন্যমাত্রা যোগ করল। এখন থেকে আমি সংস্কারভারতীর একজন হয়ে গেছি।

বহরমপুরে শিক্ষক সম্মেলন

রাষ্ট্রীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলন গত ৬ সেপ্টেম্বর ৩১ জন শিক্ষকের উপস্থিতিতে বহরমপুর শহরে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অবনীভূষণ মণ্ডল ও সাধারণ সম্পাদক অরূপ সেনগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় জেলা সভাপতি হিসেবে সমর দেবনাথ ও সম্পাদক হিসেবে প্রদীপ কুমার খাঁ নির্বাচিত হন। সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে রাখিবন্ধন অনুষ্ঠান হয়। প্রকাশ থাকে যে এই সংগঠনের সর্বভারতীয় সংগঠন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের ষষ্ঠ রাষ্ট্রীয় অধিবেশন আগামী অক্টোবর মাসের ৯, ১০ ও ১১ তারিখে নাগপুরে অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনে প্রতি জেলা থেকে ৫ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করবেন বলে জানা গেল।

পুরুলিয়ায় জন্মাষ্টমী শোভাযাত্রা

হারিয়ে যাওয়া ‘হরর্ ফিল্ম’

রূপশ্রী দত্ত

বাংলা ছবির জগতে এক সময় ‘হরর্ ফিল্ম’-এর জোয়ার এসেছিল। এগুলি গোয়েন্দা ছবি নয়, ঘাত প্রতিঘাতপূর্ণ থ্রিলার নয়, এক অন্যমাত্রিক, হাড়-হিম করা, ভয়-জাগানো ‘আতঙ্ক-চলচ্চিত্র’। তা কখনও এসেছে অতিলৌকিক (সুপার ন্যাচারাল) মাধ্যমে, কখনও বা ভৌতিক উপদ্রবের আড়ালে দুর্জন মানুষের কলকাঠিতে, আবার কখনও বা কোনো মনোবিকারগ্রস্ত ধারাবাহিক হত্যাকারীর নানা ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডতে। ভয়ের আবহকে ঘনীভূত করতে, সেই হত্যাকারী পর্দায় এলেই, নেপথ্যে বেজে চলে কোনো শিস্-এর সুর।

উত্তর কলকাতার বেলেঘাটা অঞ্চলে অধুনালুপ্ত প্রেক্ষাগৃহ আলোছায়াতে মুক্তি পেয়েছিল এমনই এক ভয়-জাগানো ছবি ‘কালোছায়া’। সময়টা গত শতাব্দীর পাঁচের দশকের প্রারম্ভ। মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন স্বনামধন্য অভিনেতা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা ছবিতে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম ভূমিকায় গুরুদাসের সেই একাত্ম হয়ে যাওয়া বিস্ময়কর অভিনয় প্রতিভার স্ফুরণ হতে তখনও অনেকটাই দেরি। ১৯৫১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘জিঘাংসা’ ছবি এই শ্রেণীর ছবির আরেক নিদর্শন। তখন সিনেমা হলের মধ্যেই সিনেমা শুরুর আগে ফেরিওয়ালার হাতে

রঙ্গম

ঘুরত ক্ষীণকলেবর সিনেমার বইটি। তাতে লেখা থাকত ছবির কাহিনির সংক্ষিপ্তসার। পরিণত বয়সের মানুষরা স্মরণ করতে পারেন ‘জিঘাংসা’ ছবির সংক্ষিপ্ত সারসমন্বিত কাহিনির হাড়-হিম করা সেই ক’টি পংক্তি— ‘হাঃ হাঃ হাঃ পৈশাচিক অট্টহাসি ভেসে এল, নিঝুম রাত্রে, জলার ধার থেকে।’

১৯৫২/৫৩-তে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি অসিতবরণ ও মঞ্জু দে অভিনীত ‘কার পাপে?’ ওই সময় নাগাদই মুক্তিপ্রাপ্ত দু’টি হরর্ ফিল্ম ‘সঙ্কেত’ ও ‘কঙ্কাল’। অবশ্য এ কঙ্কাল রবীন্দ্রনাথের ওই নামের ছোটগল্পটি নয়। সেটি ছয়ের দশকের গোড়ায় ‘সন্ধ্যারাণী’ নামে মুক্তি পেয়েছিল। মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন নবাগতা নায়িকা কল্যাণী ঘোষ।

শিশির মিত্র ও গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু সম্মিলিতভাবে গড়ে তুলেছিলেন ‘বসুমিত্র’ নামক চলচ্চিত্র-প্রতিষ্ঠান। গত শতকের পাঁচের দশকের শেষে বাংলা ছবি দেখতে গেলে অধিকাংশক্ষেত্রেই ‘ট্রেলার’ দেখান হোত অন্য ছবির। ‘বসু মিত্র’ প্রযোজিত সব ছবিই ‘হরর্ ফিল্ম’। তাই ‘ট্রেলার’-এর ওপর ক্যাপ্শন লেখা থাকত—‘বসু মিত্রের ভয়াল- ভয়ঙ্কর’। মানুষ ভয় পেত আবার কোথায় যেন চোরা আকর্ষণও অনুভব করত। বিজ্ঞাপনও এ জাতীয় ছবি দেখতে দর্শককে আকর্ষণ করত।

রবীন্দ্র-শতবর্ষে ১৯৬১ সালে সত্যজিৎ রায় নির্মাণ করেছিলেন ‘তিন কন্যা’ ছবিটি। রবীন্দ্রনাথের ‘পোস্টমাস্টার’, ‘সমাপ্তি’ ও ‘মণিহারা’— এই তিনটি ছোটগল্পের সমাহার ওই ছবিটি। এর মধ্যে ‘মণিহারা’ তেমনই এক ‘ভয়-জাগানো ছবি।’ নায়িকা মৃত্যুর পরও তার অলঙ্কার বাক্সের তীব্র আকর্ষণ ছাড়তে পারেনি। তাই, অশরীরী হয়েও সে আবির্ভূত হোত। এই লোমহর্ষক চরিত্রটি অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য ভাবে আন্তরিক করে ফুটিয়ে ছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত অভিনেত্রী কণিকা মজুমদার। ‘চুপিচুপি আসে’ এই শ্রেণীর অন্যতম ছবি। ইদানীং বাংলা চলচ্চিত্রে ওই জাতীয় ছবিতে ভাটা পড়েছে। হিচ্কক্-এর হরর ফিল্ম ‘দি বার্ডস’ দেখে একালের এক দর্শক আক্ষেপ করছিলেন—নিরীহ পাখিদের আকস্মিকভাবে হিংস্রতায় বদলে যাওয়া, সারা শহরে আতঙ্ক সৃষ্টি করা— এমন ‘থিম’-এ কি বাংলা ‘হরর ফিল্ম’ করতে পারেন না কোনো দক্ষ পরিচালক?’ ■

শব্দরূপ-৭৬২ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

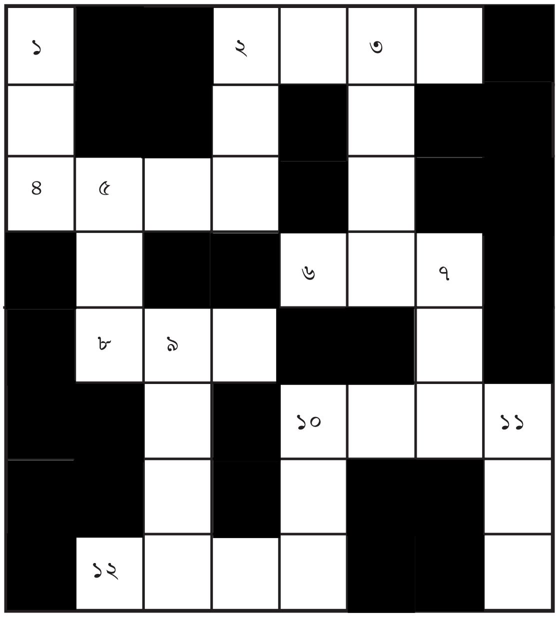

সূত্র :

পাশাপাশি : ২. যে গ্রন্থে সর্বশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞাতব্যের উত্তর পাওয়া যায়, ৪. জগতের ভরণকর্তা; বিষ্ণু, ৬. ব্যবহারজীবী, আইনব্যবসায়ী, ৮. আনাড়ি, অপটু, ১০. অভাব, অপ্রতুল, না চলা, ১২. যেখানে-সেখানে।

উপর-নীচ : ১. ছোট থালা, ২. ধৃতরাষ্ট্রের কনিষ্ঠভ্রাতা (দাসীপুত্র), ৩. বিষ্ণুর গদা, ৫. শ্বাসগ্রহণ ও ত্যাগ, ৭. কপাল; ভাগ্য, ৯. ঋষিবিশেষ (পূর্বে ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন, পরে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন), ১০. নৌকার হাল, ১১. নববিবাহিতা।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৫৯

অ			অ	ক্ষ	পা	দ	
চ্যু			ন		ই		
ত	লা	ত	ল		ক		
	ল			স	ন্তা	প	
	সা	জ	শ			সা	
		য়		অ	ন্ত	রী	ক্ষ
		দে		দি			ত্রি
	ভ	ব	ভূ	তি			য়

সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
সুশীল কয়াল
কলকাতা-৬

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

 ৭৬২ সংখ্যার সমাধান আগামী ৫ অক্টোম্বর ২০১৫ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

 ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

 যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

 চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।

 ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।

 পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।

 গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।

 স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।

 লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

 রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

 লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা ।। বিক্রমাদিত্য ।। ৩

ঐতিহ্য ও সমসাময়িকতার মেলবন্ধন

স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা : ১৪২২

পরিবারের সবার সঙ্গে ভাগ করে পড়ার মতো

উপন্যাস

শেখর সেনগুপ্ত — নৈরাজ্য (রহস্য উপন্যাস)

সুমিত্রা ঘোষ — তোরা কোন গগনের তারা? (সামাজিক উপন্যাস)

প্রবন্ধ

ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, ড. প্রসিত রায়চৌধুরী, অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ রায়, নৃপেন্দ্র প্রসন্ন আচার্য, অমলেশ মিশ্র, দেবব্রত ঘোষ, রমেশ পতঙ্গে, নবকুমার ভট্টাচার্য, বরুণ দাস, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিত রায়।

বড় গল্প

গোপালকৃষ্ণ রায়

গল্প

রমানাথ রায়, শেখর বসু, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, এষা দে, গোপাল চক্রবর্তী, গার্গী দেব, সিদ্ধার্থ সিংহ।

বিচিত্র রচনা

পিনাকপাণি ঘোষ — চিঠি মিঠি, অর্ণব নাগ — সেকালের মেসবাড়ি, তাপস অধিকারী — পশুপাখির মাতৃস্নেহ।

চরিতকথা

জহর মুখোপাধ্যায় — কলকাতায় প্রথম নিবেদিতা

পুরাণকথা

বিজয় আঢ্য — এক রূপান্তরিত পুরুষের কথা

ভ্রমণ

সুভাষ বিশ্বাস— রথ উৎসবে হাম্পি

খেলা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়— বিষ্ণুপুরের দশাবতরী তাস

মূল্য : ৭০ টাকা।। সত্বর কপি বুক করুন।। মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
14 September - 2015 - Rs. 10.00

দাম : ১০.০০ টাকা